মণীন্দ্র রায়ের কাব্যসংগ্রহ

কাব্যসংগ্রহ

১

মণীন্দ্র রায়
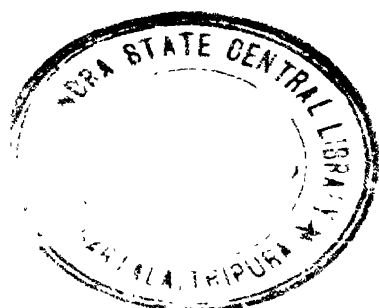
দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : বারো টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস,
৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

কল্যাণীয়া অতন্দ্রিলা রায়-কে

প্রকাশকের কথা

একালের বাংলা কবিতায় মণীন্দ্র রায়ের স্থান যে প্রথম সারিরও একেবারে প্রথম দিকে এ নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু তাঁর কবি-চরিত্র ঠিক কী ধরনের সে বিষয়ে স্পষ্ট ক'রে বলা শক্ত।

একটা কথা এখন সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন, মণীন্দ্র রায় খুবই পরিবর্তনশীল কবি। কবিতার বই তিনি লিখেছেন ইতিমধ্যে প্রায় বাইশ-তেইশখানা, এবং এই সংগ্রহ ছেপে বেরোবার আগেই আরো দু-একখানা বেরোলে অবাক হবার কিছুই নেই। কিন্তু এতো অজস্র লিখেও তিনি সব সময়েই নতুন, তাঁর কোনো বই-ই একরকম নয়, প্রত্যেকটিই অন্য বইয়ের থেকে আলাদা।

তিনি যে প্রগতিশীল কবি এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু 'মোহিনী আড়াল' আর 'ভিয়েতনাম' দীর্ঘ কবিতা দুটিকে কি একই গোত্রে ঠাঁই দেওয়া যায়? কিম্বা আরো পরে লেখা 'এই আমার বিষ, আমার জীবন' আর 'লেনিন' কবিতাকে? কিন্তু সেখানেই থামেননি তিনি, লেনিনের পরেই লেখেন 'মৃত উল্কা ও অজাত শিশুর সংলাপ'!

পাঠককে তাই স্থির হ'য়ে বসতে হয়। বোঝবার চেষ্টা করতে হয় এমন এক কবিকে, যিনি একালের বিষ আকণ্ঠ পান করেছেন, যিনি আত্মবিচারে ছিন্নভিন্ন, কিন্তু কিছুতেই তিনি হার মানতে চান না। এর একটা বড়ো কারণ, মানুষের জন্যে তাঁর ভালোবাসা। কখনো এ ভালোবাসা ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে সমাজের দিকে চ'লে যায়, কখনো আবার সামাজিক পরিবেশে আশ্রয় না-পেয়ে ফিরে আসে নিজের দিকে, আশ্রয় খোঁজেন ইতিহাসের মধ্যে, ইতিহাস-চেতনার মধ্যে—এমন কি মহাকাব্য আর লৌকিক পুরাণের মধ্যেও। আর সেজন্যেই হয়তো তিনি লেখেন 'এই জন্ম জন্মভূমি', 'ভিয়েতনাম', 'লেনিন', এবং দীর্ঘ কবিতার এলাকা ছেড়ে কাব্যনাটকে গিয়ে লেখেন, 'নাটকের নাম ভীষ্ম' কিম্বা 'লখিন্দর'।

কবিতা লিখছেন মণীন্দ্র রায় চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধ'রে। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলো পড়লেই বোঝা যায়, শুধু লেখার জন্যেই লিখছেন না তিনি। তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূলে রয়েছে গভীর একটি সামাজিক দায়িত্ববোধ। এই

দায়িত্বের ফলে তাঁর মধ্যে কোনো আত্মগরিমা আসেনি, তাঁকে পুরোহিত বা বিচারকের আসনে বসতে দেখা যায় না—অন্যায়কে তিনি নিষ্ঠুরভাবেই বিদ্রূপে কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু নিজেকেও তিনি রেহাই দেননি—কয়েকটি কালশিটের দাগ তাঁর নিজের পিঠেও সুস্পষ্ট।

এই হলেন মণীন্দ্র রায়। যারা অবিচার করে এবং সেই অবিচারের শিকার হয় যারা—এই দু-দিকের কথা বলতে-বলতেই জেগে ওঠে একটা তৃতীয় অস্তিত্ব—যার নাম কবিতা, এবং বিশেষ করেই মণীন্দ্র রায়ের কবিতা।

এ-কবিতা সার্থক হয়েছে ছোট মাপের লিরিকের মধ্যেও। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ কবিতার দিকেই ঝোঁক তাঁর বেশি। কেন তিনি এ ধরনের বড়ো আকারের কবিতা লিখছেন, এবং তাঁর কবিতার সত্যিকারের মর্ম কথাটি কী, সেটা কবিকেই লিখে দিতে অনুরোধ করায় তিনি একটি লেখা দেন—'দীর্ঘ কবিতা কেন লিখি।' এই কাব্য সংগ্রহের শেষের দিকে সংযোজিত হ'লো কবির সেই বক্তব্য।

সুধাংশুশেখর দে

মণীন্দ্র রায়ের
কাব্যসংগ্রহ
১
(দীর্ঘ কবিতাবলী)

সূচীপত্র

মো হি নী আ ড়া ল

এক আমি, বহু হব,
ঈশ্বরের মুখে
মানুষ শুনেছে এই সাধ। মানুষেরই
শ্রুতি সে তো! অনেক জড়াতে
কতো প্রত্ন শতাব্দীর সাম্রাজ্য, প্রাসাদ।
অনেক ছড়াতে
কতো উল্লোলিত যুগে শুল্ক, উপকূল।
স্তূপের আড়ালে তবু মানুষের মন
ডোবে আজো। হস্তিমূর্খ, একা,
কাটে তবু দিন তার স্বকীয় কয়েদে।
এই তো একান্তবাসী বিংশতির শেষ।
কে খোঁজে এখন, বল, দেয়ালের ওপারে হাতের
মৃদু সাড়া? কার মর্মমূলে
প্রতীকী মুখোশ নয়,
কিম্বা নয় মানবতা-ধারণার চোয়ানো আতর,
যেন গাছগাছালির কাঁচা তাজা মাঠের বনের
বোঁটায় ফুটন্ত ফুল, তেমন মানুষ?
কার রক্তে একবুক মমতার মতো
জীবনের সে অনুদ্রাবণ।

ঝন্‌ঝন্ প্রহর বাজে না-শোনা ঘণ্টায় দিকে দিকে।
কে যেন সুতোয় টানে, হে পুতুল, হাত-পা মাতাল,
তুমি যে কেবলি বাঁচো, বেঁচে থাকো, শুধু আছ টিকে,
এ বেদনা মুছে দিতে মতামতে তর্কে নাজেহাল
আর কতো নিজেকে ভোলাবে? চারিদিকে জনধারা
এইমাত্র যেন সভা ভেঙেছে, উদ্‌ভ্রান্ত সেই ভিড়,
কেবল বাহিরে নয়, পথে নয়, লোকের ইশারা

চেতনারও কলরবে। তবু তুমি, বল তো বধির,
এই দ্রুত লোকস্রোত, কিম্বা আরো স্মৃতিতে যা আছে,
অনেক মুখের ভঙ্গি, বহু কথা, অনেক ঘটনা,
বাড়িতে রান্নার স্বাদ, হাসপাতালে ওষুধের ঝাঁজে
অনেক সকাল-সন্ধ্যা, বহু গান, নাট্য-প্রযোজনা,
অথবা শ্মশানযাত্রা, কিম্বা ভোরে শিশুর আদর···
সব নিয়ে, সব ছেড়ে, যা তুমি—তোমার গতকাল,
বল তো শুনেছ তুমি কোথায়ো এমন কণ্ঠস্বর
যা শুধু ভদ্রতা নয়, উষ্ণ, আর্দ্র, উথালপাতাল ?

হৃদয় পাথর আজ। কিম্বা সেই নাম
সুদূর মলিন কোনো ধারণার মতো।
যেমন আগুন কিম্বা পতনের পাপের অথবা
সুন্দরের অনুভূতি, তেমনি হৃদয়
যাই-যাই যৌথস্মৃতি, বুঝিবা ফসিল।

অথবা হৃদয় যেন
স্বভাবেরই স্বোপার্জিত সাজ।
যেমন হাঁসের
পিচ্ছিল পালকে জল,
সব ডাকে সব শব্দে তেমনি হৃদয়
থাকে উদাসীন।
‘কে আমার’ হিসাবের ছাদের তলায়
এখন বিচার শুধু ‘কী আমার’? যেন
তালিকার গলাবাজি নীলামের হাটে।
আঙুলের ফাঁকে তবু মিনিটে মিনিটে
ঝ’রে যায় যা-কিছু যাবার!

২

যাক না, সোমেন বলে, যা যাবার যাবে যদি যাক।
সোমেন আমার বন্ধু, বলে, দুঃখ যেহেতু জোরালো,
চড়া তারে বাঁধো দিন। ক্লান্ত লাগে, রয়েছে মৌচাক
চৌরঙ্গির কতো বার-এ, তুদণ্ডের মায়াপাত্রে ঢালো
তরল আগুন। বন্ধু, রঙিন বুদবুদ কোনোদিন
দেখেছ কি, শিশুরা ওড়ায়? শেষে ফাটে, কে না জানে!
কিন্তু যতোক্ষণ থাকে, কী সুন্দর নির্ভার মসৃণ!
এর বেশি খুঁজো না হে, অস্তিত্বের এই শেষ মানে।

তবে কি খুঁৎখুঁতে আমি? বেয়াড়া অথবা
মূর্খ, বেমানান ভীতু? অন্য কিছু খুঁজে
কেবলি কি হাততালির চেয়েছি বাহবা?
নাকি তুর্জনের মতো সব শান্তি মুছে
শাবল চালাই, সেকি আমারই অস্থির
বিপন্ন আত্মার রুগ্ন উত্তেজনা-প্রীতি?
সোমেনেরা আছে ভালো, শান্ত সুখনীড়
ওদের? আমারই শুধু কাঁপে মূল্যরীতি?

জানি না। অনেক রাতে
মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। একা
তরল আঁধারে ধীরে চোখ মেলি, ভাবি,
কে আমি? রয়েছি কোন ঘরে?
দরজাটা কোথায়, কোন দিকে?
যেন আমি ডুবে গেছি,
চারিদিকে বোবা ভয়, অতল আঁধার।

যেন আমি নেই।

আশ্চর্য সে অনুভূতি,

মৃত্যুর পরের মতো

কিম্বা জন্মপূর্ব পরবাসী।

কয়েক মুহূর্ত শুধু !

আর তারপরই

ধীরে ধীরে ভেসে উঠি, এক ভরা নিশ্বাস, শত স্মৃতি

চারিদিকে যোগাযোগ, নাড়ির বাঁধন।

জেগে উঠি।

জানলায় দাঁড়াই। রাত্রি। ঘুমের নীলিমা

যতদূর চোখ যায়

কার্নিশের দেয়ালের বাড়িঘর ঢেকে

ছোঁয়া যায়, এমন নরম।

ঘুমের শহর

যেন এক উন্মাদ নারীর

হা-হা হাসি নগ্নতার ছুটে ফেরা শেষে

এলোচুল-বলিরেখা বিকৃত মুখের

সব ছিলা শ্লথ ক'রে

চোখের ইতর দীপ্ত নিভিয়ে, এখন

ফুটপাতে গা-ঢেলে শুয়ে

ফিরে পায় স্বপ্নদেখা মুখের উপর

শৈশবের ঠাণ্ডা কোমলতা।

কিম্বা সবই মনগড়া ? কোমল ঘুমের

শিশুমুখ নয়, ভয়-মোছা

নিরুদ্বেগ মায়ের আঁচল বুঝি নয়,

এ যেন সুষুপ্তি থেকে বহুদূরে ঝিমধরা তন্দ্রায়

না-জাগা না-ঘুমে ডুবে

স্তব্ধ নীল শহরের রাত্রির সাগরে
উপবিতলার ঢেউ-বিভঙ্গের শান্তির গভীরে
তিমি ও হাঙর, মাছ, জলজন্তু, কড়ি ও ঝিনুক
এখানে সবাই বুঝি চির-নিরাশ্রিত,
লোনাজল ছেঁড়ে একা
ঘরে ঘরে মগ্ন-চেতনায়।

৩

অন্তত অরুণ, টুটু, নীলা, কি যাদের
দেখি এ পাড়ায়, কিম্বা চেতলার বরাট, কালীঘাটে
মিস্টার চৌধুরী—যারা পরিচিত, অথবা আপিসে
'হেঁ-হেঁ দাদা', 'ব্যাটা পাজি' নরমে-গরমে
সাত ঘণ্টা রোজ যারা থাকে পাশাপাশি,
কিম্বা অ্যালসেশ্যান-পোষা বেঁটে মোটা সান্যাল সাহেব
এবং গৃহিণী তাঁর ব্লাড্প্রেশারে তিরিক্ষে মেজাজ,
অথবা মাস্তান যুবা চৌমাথার মোড়ে,
আর যতো চোলি-পরা নবীনা যুবতী -
যারা চেনা, অল্প চেনা, কিম্বা যারা গল্পে পরিচিত,
সবাই এখন তারা যদিও ঘুমের
নাম জপে, সকলেই তারের উপরে
সময়ের ভারসাম্য খুঁজে তবু জানি
প্রতিটি হৃদয়ে দুটি মন—
নিজেরই ছায়ার সঙ্গে কানামাছি খেলে এই রাতে
নিজেকে ভোলায়।

সোমেন, তুমিও তাই। যেখানে পালাও
ইচ্ছার ভিতরে ছায়া কাঁপে।

ও-রঙিন পাত্র বড় ছোটো, সমুদ্রেও
ভাসাবে না এই মনস্তাপে।
ধরা যাক, কিছু নয়, ব্যাঙ্কের খাতায়
একের পিছনে শূন্য দিয়ে
বহু টাকা বাড়ি-গাড়ি ফ্রিজ টেলিফোনে
বহু সিঁড়ি গিয়েছ ডিঙিয়ে ;
ধরা যাক, বউ ভালো, খাও ভালো, ক্রমে
পরস্বহরণও মোলায়েম,
অভ্যাসে বিবেক চাপা, কালো টাকা শাদা,
সমাজের মাথায় কায়েম—
অভ্যাসই তখন তুমি। কয়েকটি কাজের
নির্ভুল যান্ত্রিক আচরণ—
এই শুধু, এই তুমি, আর কিছু নও,
অন্তহীন পুনরাবর্তন।
সোমেন, অস্তিত্ব জেনো আগুনের কণা,
চাপা দিলে পুড়ে যায় ঘর।
এড়াতে ডাকিনী-মায়া সাধো যদি, তুমি—
পরিণামে তুমিই পাথর !

ভেবো না আমিও দলছাড়া !
ঘুরেছি অনেক, তবু
মাঝে মাঝে মনে হ'তো, বিদেশী পথিক
চিনে নিতে হবে সব কিছু।
রাস্তায় মানুষ দেখে চোখ মেলে দেখেছি মানুষ,
কে কেমন হাঁটে, কথা বলে।
দেখেছি গঙ্গার ঘাটে জাহাজের ঢেউয়ে
জেলে ডিঙি নাচায় গলুই।

দেখেছি স্লুইস গেটে শাদাফেনা ঝ'রে পড়া জল,
অথবা বয়লারে রাঙা রাত্রির আকাশ।
জানি দেশ গ'ড়ে তোলে এই সব যন্ত্রকুশলতা,
যন্ত্রকে দেখেছি তাই ; ক্রেন-পুলি-লেদে-ও-চাকায়
ঘুরন্ত বিদ্যুৎ বাষ্প। দেখেছি চাষীর
করতলে রোদ ঢেকে দূরে চাওয়া মাঠের উপর
ধানগুলি আদিগন্ত দুলেছে হাওয়ায়।
দেখেছি অনেক, তবু আজো
আমিও, সোমেন, শূন্য তোমার মতোই
মানুষের পাইনি খবর।
রাস্তায় ছড়ালো শুধু
সব সাধ জীবনের,
স্বপ্ন, আশা,
আজো পরবাসী।

৪

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর দিন, বুঝিবা বরাহ অবতার
গোয়ার দাঁতের চাপে তছনছ করে রসাতল।
সমস্ত সম্পর্কগুলি ওল্টানো দূরবীনে কেবা কার !
এর মুণ্ড ওর ধড়, বুঝে নিতে প্রাণান্ত ধকল।
অথচ যতোই ঘোরো, গলিঘুঁজি শহরে বা গাঁয়ে,
নোটবইয়ে টুকে নাও মানুষের স্মৃতি ও ঘটনা ;
তবু সে ছকের মধ্যে নড়াচড়া ডাইনে আর বাঁয়ে,
অভিজ্ঞতা কল্পনার যতো, সত্য মূলত ততো না।
কারণ, উপমা দিলে বলা যায় একালের মতো,
গাড়ি বটে স্বতশ্চল, যেতে পারে, যাবে, এও ঠিক,
সুইচে স্ফুলিঙ্গ তবু না দিলে কি স্থাণুতা ব্যাহত ?
যে ছোঁয়া মেলে না, তাই দাঙ্গা ক'রে হাসে দশদিক

তাই, বাবু-ইচ্ছে বুকে শুশুক-নিশ্বাসে মাঝে মাঝে
পরার্থ জাগায় বটে , শিঙ নেড়ে বনের মহিষ
তেড়ে এলে, ব্যস্ত পায়ে ঘরে যেতে, যেন বা অকাজে
কেটেছে সময়, বল ঘড়ি দেখে, 'বেলা গেল, ইস !'

অথচ বেলা যে যায়, যেতে থাকে, বুকের ভিতরে
ঘণ্টা বাজে, সূর্য ক্রমে তিরিশ ডিগ্রিতে নেমে আসে,
ভুতুড়ে পাণ্ডুর ছায়া কবন্ধের মতো খেলা করে ,
এদিনে কোথায় ঘর, দাঁড়াবে বল তো কার পাশে ?

রক্তে কি লবণঘ্রাণ ?
কামনার স্বাদ মনে জাগে ?
সে কুণ্ডে নেমেছি আমি ।
নারীর শরীর
বুকে নিয়ে বহুদিন
পরকীয়া ঘরে
দেখেছি, দেহ কী দিতে পারে ?
জেনেছি, ভোগের শেষে বিশুষ্ক বিষাদ
মর্মে আনে পাতালের টান ।
যুবক বয়সে
ফুর্তিরও জোয়ার কিছু রম্-এর বোতলে
দেখিনি এমন নয় ।
শিকারী নায়িকা
বাস স্টপে যেতে যেতে ফিরে
চেয়েছিল পিছে ।
কাছে এসে মুখে তার এনামেল-মোছা
দেখেছি মেছেতা, ঘাম, কালিঘেরা চোখ

যেন ঠাণ্ডা সাপের মাথায়
পা দিয়েছি, যেন
সে নয় আমিই ধরা পড়ে গেছি ফাঁদে।
লাফিয়ে চলন্ত বাসে বাড়ি এসে, ভয়ে,
নিজের আড়ালে, অন্ধকারে
বসেছি সেদিন ; রাত্রি জেগে
বুঝিনি খুঁজেছি কাকে, ঠিকানা কী তার ?

৫

ভালোবাসা নাম, আজ জানি।
ভালোবাসা আনন্দ অগাধ।
বুকে ধরি, দুই হাতে ছানি।
ভুলে যাই গূঢ় অবসাদ।

ভালোবাসা নদীর মতোই,
দুটি মন স্রোতে পাশাপাশি।
অথবা সে নদীরই অথই
স্রোত মনে, ভালোবাসাবাসি !

ভালোবাসা মায়ামূর্তি ধরে,
মানে না সে স্বতন্ত্র পাঁচিল।
'তুমি' 'আমি' পৃথকের ঘরে
অনায়াসে খুঁজে পায় খিল।

ভালোবাসা জীবনের সাঁকো,
কাছে আনে দূরের জগৎ।
সে মাটিতে যখনি পা রাখো,
চারিদিকে দিব্য নহবত!

ভালোবাসা হৃদয়ের চাবি ;
ভালোবাসা তৃতীয় নয়ন।
রক্তে ঠাঁই নিলে সে মায়াবী
মনের ওপারে খোলে মন।
যেন, বহুদূর থেকে শোনা···
এমন আহ্বান। যেন
বইয়ের পাতার ভাঁজে আবছা স্মৃতির
গোলাপের ম্লান পাপড়ি···
এমন বিষণ্ন অনুভতি
প্রথম প্রেমের।

নাকি দিবাস্বপ্ন সবই !
আমি কি পেয়েছি ভালোবাসা ?

সেকি শুধু মনে
দুপুরে ঘুঘুর ডাকে দিঘির উপরে
ঢেউ-ঝিলিমিলি হাওয়া ?
দেখি নি কি তার
সায়াহ্নের হৈমন্তী আকাশে
দাউ দাউ সূর্যাস্তের খনির আগুন ?
জানি, ভালোবাসা,
তুমি শান্তি বটে, তবু অপার যাতনা।
তোমার ফুটন্ত ফুলে মগ্ন ভ্রমরের
মধুক্রীড়া জেনেছি বারেক,
আর দিনে দিনে
সেই লগ্নতার স্মৃতি ব্যর্থ সন্ধানের
দিগন্ত-আড়ালে চাপা বিদ্যুতের জ্বলে জ্বলে ওঠা···
আজীবন বিক্ষত হৃদয় !
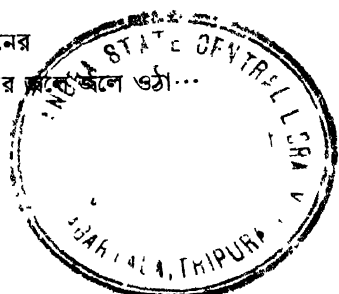
কেননা, সংসার তার লূতাতন্তু আনাচে কানাচে
প্রেম থেকে কামে, কাম আরামে-বিরামে ধীরে ধীরে
ফাঁদ পেতে ধরে যতো এ হৃদয়ে ব্যাকুলতা আছে ;
সব সূক্ষ্ম রণনের অনুলগ্ন স্নায়ুগুলি ছিঁড়ে
নির্বোধ সমানুপাতে মাঝারির দঙ্গলে মেশায়।
কেননা, এমন দাহ, যেন স্বর্গবহিষ্কৃত, ক্রমে
জাগায় হৃদয় তাই শয়তানেরই বিরুদ্ধ নেশায়,
প্রতিযোগী সমাজের অপদস্থ জ্বালার মলমে
খুঁজি ব্যর্থতারই বুকে ক্ষণস্থায়ী ঝলকে সান্ত্বনা।
অথচ আমি যে ভ্রান্ত, প্রতারিত, লুকাতে সে গ্লানি
যতো না আতসবাজি, শূন্যে ঝরে সে শূন্য আল্‌পনা ;
আত্মার বিবরে কাঁদি স্বপ্নভ্রষ্ট, দীন, অভিমানী।
কেননা, সম্পর্ক মরে নিপ্রেমের শ্বাসরুদ্ধ মনে ;
নিজেই নিজের বৈরি, বন্ধ করি মাঝের দরোজা,
জানি না, কী বিকারের বাষ্প জমে সে অর্ধচেতনে,
একান্ত অপরিচিত আমি আত্ম-ব্যবচ্ছিন্ন বোঝা।
তখন বাহিরে যতো আছে আসি, কথা বলি, হাসি,
হৃদয়ে বধির, যেন বাক্‌প্রতিমা গেছি সবই ভুলে,
পরদেশী বন্দরের ভাষাহীন উদ্‌ভ্রান্ত খালাসী,
একাকীত্বে সাঁকো বাঁধি শুধু যেন দেহেরই উপকূলে।

অথচ দেহ-যে ক্রমে ক্লান্ত নিত্য পুনরাবর্তনে ;
ভুলি তাই—ঘরে যেতে কী ছিল একদা প্রতিশ্রুতি···
মনের ওপারে মন খুলে যাবে ভেবেছি দুজনে···
আজ শুধু বেঁচে আছি—বাঁচা দীর্ঘ মৃত্যুরই প্রস্তুতি !

মাঝে মাঝে
মনে পড়ে মুখ
পুরনো বন্ধুর।
মাঝে মাঝে
দেখা হয়, হাত ধরি,
হাসি।
এটা-ওটা কথা বলি।
এখন কাজের লোক,
বাড়িতে চায়ের ছলে
নিয়ে যেতে চাই।
হাসে ওরা।
কেউ আসে, আসে না অনেক।
তবু মনে থাকে
সেইসব কথা, মুখ, হাসি।
আমারই কৈশোর তারা।
জাগে, বলে যায় :
কতো অনায়াসে
খোলা গেছে সেদিন হৃদয়,
কেমন সহজে যাওয়া আসা
মন থেকে মনে !

মাঝে মাঝে
ভিতরে তাকাই, দেখি .
মনের গভীরে
এখনো অস্পষ্ট নড়াচড়া,
ইতিহাস, স্মৃতি।…

'ছ' হাজার বছরের ভারতবর্ষেব
পোড়ামাটি ঘটেব আভাস,
মানুষের কামনার ধাবাবাহিকতা।

মাঝে মাঝে
প্রতীকী মানুষ
বলে কানে কানে :
গুহাচিত্রে প্রকৃতি-জয়েব
কোন প্রয়োজনে তাবা
মৃত্যুর ছায়ায়
খুঁজেছিল অমবতা।...

আমি ছুঁতে পাবি
আমাব স্বপ্নেব ইমাবতে
সেই সব অলিন্দ এখনো।
ঢুকে যেতে পাবি
পুবাণের রূপকল্পে
মহাকাব্য-জীবিত মনেব
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দব মহলে মহলে

অথচ জীবনে অবরোধ...
ভাষাহীন, একা।
চারিদিকে নাম শুধু।
যেন শোকসভা,
দীর্ঘ নীববতা।
হাত বাড়ালেও আজ
পাশের মানুষ
স্মৃতির ভিতরে মৃতদেহ।

কাছে থেকে কেউ কাছে নেই।
ব্যক্তি-শুষে-নেওয়া ছায়া,
শূন্যের জগৎ।

বুকের ভিতরে তবু ধ্বক্ ধ্বক্…
ধ্বক্ ধ্বক্…একি ব্যাকুলতা !

৭

কবিতা, পাতাল-নদী, নায়িকা আমার.
আর কতো হতাশার বিবরে একাকী
বিকারে ভোলাবে ? দেখ, পাখি ডানা থেকে
রাত্রির তমসা ঝেড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে
চাখে ভোরের আস্বাদ। দেখ, গাছে গাছে
যুবার প্রতীকে আলো শ্যামারুণ, তাজা।
এমনকি হা ঘরে, সেও ফুটপাতে শুয়ে
ঘুমের সোহাগে রোজ নবীনা আশায়
বলীয়ান। শুধু আমি, আমারই হৃদয
কেন অন্ধকারে ডুবে জীবিত-মৃত্যুর
কবরে প্রদীপ জ্বালে ? কেন এ বিষাদ ?
কেন পতনের মদে অবরুদ্ধ ঘরে
রুগ্ন কামনার ম্লান গালিচার ডাকে
শুধু দীর্ঘশ্বাস, শুধু আর্তির বিলাস ?

জানি জানি, প্রেম তুমি, কবিতা আমার,
কতো নিশীথের চুলে নক্ষত্রকুসুম
ফুটিয়েছ মনে। নারী, বাসর পোহালে

একদিন শিশু কাঁদে, হামাগুড়ি ঘরে
আঙিনার হাঁটি হাঁটি। একদিন ক্রমে
বিশ্ব উঁকি দিতে চায়; বেজে ওঠে কড়া।
শোনো নি সে ডাক? তবু বুকের ভিতর
কেন এ পাঁচিল? কেন দিনেদিনে বাড়ে
ব্যবধান – দিনে দিনে মরে ভালোবাসা
মাটির অসহযোগে? সন্ততির চোখে
একবার হেসে উঠে মমতার দিন
কেন জানালায় ঝরে? কেন পলে পলে
আতিথেয় জগতের নগ্ন বহিষ্কারে
এত ভূমিকম্প বুকে? এমন খোয়াই।

কবিতা, প্রবাণা প্রিয়া, ওগো স্বপ্নময়ী.
তুমিই শুশ্রূষা, তুমি দ্বিতীয় জন্মের
সরণি আমার। প্রেম দু'জনের ঘরে
কতো দিশেহারা, কতো তন্ত্রক্রিয়াচারে
শবগন্ধা। বাঁচাতে যা পারে নাম তার
মমতারই জাগরণ, সমুত্থিত পথ।
কেননা সে চলে, তাই ঘণ্টাকটকের
হাতুড়ি ও হৃদস্পন্দের কালস্রোত. তাই
গতির যৌবনে মন জোড়া দেয় সাঁকো,
কাছে আসে দূর, বুকে গত অনাগত
প্রণয়ের পুষ্পরেণু ফলের শরীরে
একবৃন্ত। তাই শোকে জেগে ওঠে শ্লোক;
বাসর পোহালে তাই দরজার উধাও
ডাকে দিগন্তের নীলে মুক্ত মনোরথ।

৮

নামি
মেলায় তাহলে।
ছাওয়া
মানুষের।
কাঠের পুতুল, চুড়ি, পুঁতির মালায়
মানুষের খুশি।
ধুলো,
অকারণ হাসি,
গায়ে গা লাগিয়ে ঘোরাফেরা ;
যেন মনের সাঁতার
মানুষের ঢেউয়ে ঢেউয়ে !
এমন বিস্ময়
যেন আবিষ্কার
নিজেরই বুঝিবা · এও আমি !
এমন ঘনতা
ভিড়ে, নিজের ভিতরে
সচলতা। এই আমি !

বসি
যামিনী রায়ের ঘরে।
ছবি।
লোকজীবনের
নাড়িতে আঙুল রেখে
রূপের আদল।
রেখা
বধূর, মায়ের,
প্রতিমার ;

রঙে রঙে স্নিগ্ধ ভালোবাসা ,
চালচিত্রে আঙিনায়
চোখের আকাশে
পথ
মনে মনে ।
আছি এরই কাছাকাছি
ক্ষণকাল,
মগ্ন যোগাযোগে
স্থির আশার শিকড়ে
শ্যামল বাঙালী, ভারতীয় ।

ডুবি
সুরের দ্রাবণে,
ভাসি অনেকের স্রোতে ।
হল্-এর এদিকে ছায়া
মানুষের শ্বাস ,
ওদিকে মঞ্চের আলো ।
রবিশঙ্করের
সেতারের মীড়ে মীড়ে
আলি আকবরের
সরোদে গমক বাজে ।
প্রেমিক প্রেমিকা যেন ,
কিন্নরমিথুন,
এ ওকে জড়ায় বুকে বুকে
অথবা সে বিরহের
দিব্য চকা-চকী,
আদিম বেদনা যেন,
সমব্যবধানে
ঘুরে-ঘুরে উঠে-নেমে

ডানার ঝাপটে পাকে পাকে
খোঁজে আমারই হৃদয়…
আমি জাগি
শিল্প-চেতনার ডাকে,
একই জন্মে দ্বিতীয় জীবনে।

২

তেমনি জাগরণ—যেন ব্যস্ত শত রেললাইনের
এদিকে ওদিকে ছোটা, কাটাকুটি কিম্বা কোণাকুণি
জংশন স্টেশানে; সেই ঘরবাড়ি, ছুটন্ত দিনের
ভাঙাচোরা মন্তাজের অন্তহীন বিচিত্র বুনুনী।

তেমনি জাগরণ—যেন স্বপ্নে পদ্মা, বিচিত্র সংসার;
ধক্ ধক্ স্টীমারের মধ্যরাতে হারানো যৌবন!
আর স্মৃতি টর্চ জ্বেলে খোঁজে ভিসা-পাসপোর্ট তার,
হতাশ কর্নারে এসে জোড়া দেয় দ্বিখণ্ডিত মন।

স্মৃতি মানবিক ঋতু, নিসর্গেরই মতো বারে বারে
মানুষের জানালা খোলে, ঘরে আনে ফাল্গুনী বাতাস,
সময়ের পাতা তাই মাথা কোটে ম্লান ক্যালেণ্ডারে;
ইচ্ছার আবেগে স্মৃতি ঢেউ ঢেউ ভেসে তোলে দীর্ঘশ্বাস

তাইতো এমন বাঁচা, ঘর বাঁধা! মৃত শতাব্দীর
শিল্পের মমতা চোখে এঁকে দেয় মানুষী মহিমা,
অন্ধকারে ডুবে তবু স্বপ্ন জ্বালি আকাশ-বাতির,
তাই চারু-অমরতা সন্তঃপাতী আমাদেরও বীমা।

ওগো বনস্পতি, তুমি মঞ্জরীতে সেজেছ নতুন !
চঞ্চল মক্ষিকা, তুমি মৌচাকে রেখেছ মধুকণা।
ধন্য ! তবু দিতে পারো অরণ্যের বিবিধ প্রসূন
একই বৃন্তে ? একই মধু গত-অনাগতের দ্যোতনা ?

আমরা সময় বাঁধি, বুকে টানি বিরূপা প্রকৃতি।
একদা যা বাধা, আজ উত্তরণে জয়ের নিশানা।
সুন্দর আসলে তাই, সংগ্রামে যা দূর যৌথস্মৃতি।
সমস্ত ললিতবোধে জাগরণই মূল্যের ঠিকানা।

সোমেন, ঘুমিয়ে নাকি ?
জেগে আছ ? আমি শহরের
দূর প্রান্তে এ নিশীথে
জেগে আছি, বড় বেশি জেগে একাকার
গভীরে মানুষ খুঁজি। আমি হতাশার
পুকুরে তলিয়ে যেতে যেতে
ঝাঁজি, দাম, হেলঞ্চের ভিতরে হঠাৎ
পায়ের নিচেই মাটি পেয়ে
ভেসে উঠেছি। আমি
জানি বিষমতা আছে···
ভালোবাসা নয়,
মিহি ভদ্র ঠাণ্ডা চতুরতা
কুকুরের মুখে বল্ ছুঁড়ে
সময়ের পাশাপাশি কেবলি ছোটায়····
স্নায়ুর আরামে আজ
সব প্রিয় নামগুলি
ফুল নয়,
সারি সারি গুবরে পোকা,
ব্যস্ত নড়াচড়া ·

জানি, দিনে রাতে
মস্তিষ্কে কেবলি উকো
ধাতব নিষ্ঠুর,
ছেদহীন দাঁতে-দাঁত ঘষা ;
মনের ভিতর থেকে
থাবা তুলে লাফ দিতে চায়
জন্তুর বিকার···
জানি পৃথিবীর হানাহানি
কেবলি নিরিক্ত করে
রুচি, সজীবতা, ভালোবাসা ,
দু'মুখো সাপের মতো
আপনারই ক্ষয়ে
গ্রাস করি মুণ্ডের আহার···
মনে হয় নেমে আসে
স্থির দ্রুত কৃষ্ণ যবনিকা ··
হঠাৎ উজ্জ্বল ও কী দিক-চক্রবালে ?'
উঠেছে নতুন তারা ?
ছুটন্ত হাউই !···
মহাকাশযান ও যে,
মানুষ, মানুষ !

নিচে শোনা সমুদ্রের ঢেউ,
জটিল সংসার ।
চারিদিকে ঘননীল
অভ্র-নীরবতা ।

কথা কও শূন্যের হৃদয় ।
কথা কও বোবা ভবিষ্যৎ ।···

আকাশহ্রদের বুকে
শতদল পাপড়ি থরে থরে

ফুটে ওঠে—
চেতনা, মানুষ !

সোমেন, আশ্চর্য হব—
যদি কোনোদিন
তোমারও বুকের নীচে
নিভৃত ভ্রমর
মাথাকুটে মরে ? কোনোদিন
তুমিও হঠাৎ, একা, তেমাথার মোড়ে
মনে মনে বল : কোন্ পথ ?

১০

কেউ যেন বলেছিল, 'আসি !'
ঝাঁপি খুলে দেখাবে সে খেলা।
শেষে কি জোটালো সেবাদাসী ?
ম্লান ক'রে স্মৃতির অবেলা
সে আজ কোথায় পরবাসী !

সে আজ কোথায় পরবাসী !
পথে তার বেলা গেল মেঘে।
গলায় আছে কি তার লেগে
লোভ ঈর্ষা দুদিকে সাঁড়াশি ?
অথবা, ঘুমিয়ে আছে, জেগে !

লোভ ঈর্ষা দুদিকে সাঁড়াশি।
পদাঘাতে ফাটে তাই প্লীহা ?
অথবা সে টাকারই বিনাশী
খোশামোদে মোক্ষ অভিলাষী !
পরিণামে জমেছে অনীহা ?

নাকি সে টাকারও অবিনাশী
ছলনার পারে খোলে মন ?
তারি ডাকে অন্ধ অচেতন
সাড়া দেয়···নিঃসঙ্গবিলাসী
হৃদয়েরও প্রত্যুদ্‌গমন।
কেউ যেন বলেছিল, 'আসি !'
আসে নি, শুনেছি শুধু গলা।
বুঝি বা আমারই পাশাপাশি
ঝিকিমিকি তার ভেসে চলা।
অথচ সে আজো পরবাসী !

তাহলে এবার
এসো, কান পাতো—
সিঁড়ি আর আঙিনার ওপারে ধুলোয়
শোনো পদশব্দগুলি। শোনো
রক্তের প্রথম সম্ভাষণ—
ছ'হাজার বছরের অবচেতনের
আদিম সূর্যের নদীতীরে
ব্যাকুলতা, 'মোহিনী আড়াল !
হিরণ্ময় পাত্র খুলে ফেল,
চোখে রাখো চোখ !'

ওগো অন্তরীণ প্রেম,
আর কবে মানবিক শ্রুতির ভাষায়
হবে উদ্‌যাপিত ? এক
বস্তু হতে চায়, সে তো মমতারই গূঢ় জাগরণে !
হৃদয়ে প্রবেশ কর, প্রীত হও, হে প্রেম আমার,
সব কপাটের বাধা, ভাঙা কড়িকাঠ,
হোক অরণির স্তূপে তোমারই শিখায়
আয়ু, জ্যোতি, ওজসের জনসমাগমে
ঊর্ধ্বশির স্বাহা ॥

এই জন্ম, জন্মভূমি

১

তাহলে এখানে এস।
আমার পায়ের
মাটিতে দাঁড়াও, দেখ
এ একটা দিনের স্নায়ুকেন্দ্রে
কী তুমুল তোলপাড়।
যেন রাত্রি-স্তব্ধতার বুকে ক্রমাগত
বেজে যাচ্ছে পাগলা ঘন্টি,
দরজা ভাঙছে কয়েদখানার,
অথচ একাকী, স্বপ্নে, আজো চোরপুলিশ
খেল তুমি পুরনো রাস্তায়।
তুমি কি শোনো না সে চিৎকার ?
চিৎকার, অথবা বোবা প্রশ্ন ?
দেখ নাকি ভূকম্পনযন্ত্রে কাঁটা ঐ
নড়ে যাচ্ছে কেমন অস্থির ! –
প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে
দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে,
ভেঙে পড়ছে স্থিতাবস্থা,
বদলে যাচ্ছে ম.নর ভূগোল,
জেগে উঠছে পাহাড়ের ক্রমচিহ্ন ঊর্ধ্বে –
সময়ের জলবিভাজিকা।
আর, তুমি মাঝখানে,
হৃদয়ে তোমার
রক্তে প্রতিধ্বনি আজ সে কোন কল্লোল ?

এ একটা অস্থির দিন,
এ একটা উদ্যত সম্ভাবনা।
আছি কলকাতায় বেঁচে,
আমি তুমি আমরা তো সবাই

আছি বাংলাদেশে, তবু
বেঁচে কতোটুকু ?
এ একটা অশান্ত দিন,
এ একটা নিঃশব্দ নড়াচড়া।
দিগন্তের তলা থেকে
নিম্নচাপে উঠে আসছে ঝড়,
দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে,
আর তাই আমাদেরও ঘরের ভিতব
পারদ রেখার লিপি দাপাচ্ছে কেমন—
বুকে কি পডছে না কিছু ধরা ?

তাহলে এখানে এস। আমাব মনেব
ডায়ালে তাকাও, দেখ, সময়-রেখাব
ভাষাগুলি কেমন অমোঘ। দেখ ঐ
সিনেমার ফ্রিজ শট-এ অতর্কিতে স্থিব
যেন-বা জীবন। যেন চলন্ত হৃদয়
হঠাৎ হোঁচটে স্থিব : প্রেমিক-প্রেমিকা
সামনে প্রসারিত হাত, হাসিমুখে চেয়ে,
দু ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, অথচ নীবব—
এ বকম ছবি। কিংবা তাও নয়, যেন
নাটক সে নয়, যেন পিকাসোব আঁকা—
নিটোলতা থেকে দূরে, ভঙ্গুর, ত্রিকোণ,
বঙের সংঘর্ষ শুধু। অথবা রূপের
তীব্র উচাটনে বাঁকা বিসদৃশ দেহ
চোখকান স্থানচ্যুত, বেয়াড়া, ব্যাকুল,
মাথার ভিতরে মাথা, হাত-পা বামন—
এ রকম প্রস্তাবনা। যেন মনে হয়
সামঞ্জস্যহীনতার চিত্রিত চিৎকার,
কেবলি হবার দিকে যেতে চায় ; যেন

বিপুল ধ্বংসের চাপে ভেঙে-পড়া সেতু
দেশে ও বিদেশে, দূরে, কাছে থেকে দূরে..
আর তাই আমাদেরও বুকের ভিতর,
শূন্যের হাঁ-মুখে ঝুলে ভাষা পেতে চায়।

তুমি কি শোনো না সে চিৎকার ?
চিৎকার. অথবা বোবা প্রশ্ন ?
চোখ দুটোতে কালো দুটো গর্ত
কেউ যেন হাতড়ায় অন্তঃসার।

অর্থাৎ যা দেখছ তার পাশেই
দেখ নাকি প্রচ্ছন্ন কার্টুন ?
যেমন নাটকে বিদূষক
হেসে হেসে চালায় তুবপুন।

অর্থাৎ যা বল তুমি বাস্তব,
রাস্তাঘাটে যা নাকি চাক্ষুষ –
ট্রাম-বাস, এবং মানুষ,
একা-একা কিংবা সবান্ধব,

যারা যাচ্ছে আপিসে দোকানে,
আর সেই প্রতিষ্ঠান সংঘ
লাভের পিঁপড়ের যাতায়াতে
পরিচিত যে সব প্রসঙ্গ,

কিংবা ধরা যাক মধ্যবিত্ত,
র‍্যাশানে বাজারে নাজেহাল,
চ্যাঁচাচ্ছে শাসাচ্ছে হচ্ছে ক্ষিপ্ত,
তবু সেই পুরনো জোয়াল ;

আর ওদিকে ছেলেটা বিদগ্ধ,
পদ্য লিখছে খালাসীটোলায়,
ক' রাউণ্ড নীট্-এর দোলায়
মধ্যরাতে ঘুষোঘুষি, রক্ত ·

আর ওদিকে মেয়েটা আইবুড়ো,
হেসে হেসে বলে সে — অসভ্য !
মুখে রঙ, ফাঁপা চুলে চুড়ো,
খালি ফ্ল্যাটে শোনা যায় লভ্য ,

আর লোকটা নিজেও কি হঠাৎ
কোনোদিন, প্রায় বেওয়ারিশ,
কার্জন পার্কের অন্ধকারে
শোনে নি সে অস্থচ্চে···মা-লি-শ্ !

অর্থাৎ বিকার চতুর্দিকে
গেঁজে উঠছে, লাগাচ্ছি মলম ;
অঙ্কটা মিলছে না তবু ঠিকে ,
ফেটে পড়ছে দগদগে জখম ,

তুমি কি শোনো না সে চিৎকার ?
চিৎকার — না, গলাটেপা কান্না ?
কান্না — না, ঘৃণার চাপা বিদ্যুৎ ?
মেঘে মেঘে বাঁকা তলোয়ার !

যেমন পূর্বোক্ত ছেলেটারই
বন্ধু কেউ খেল টিয়ার-গ্যাস,
সে মুহূর্তে তারও কি ঈষৎ
চিড় খায় না পুরনো অভ্যাস ?

হয়তো-বা সে মদেরই বোতলে
সার্ত্রে কামু আওড়াচ্ছে তুখোড়,
তবু কি নিজেরই জাঁতিকলে
হচ্ছে না সে ধরাপড়া চোর!

অর্থাৎ – পালাচ্ছে, হচ্ছে তুচ্ছ,
বুকনি যতো মুখে ফুটছে খৈ,
বুঝছে সে বেদরকারি, উহু,
সত্য যা টগবগ ফুটছে ঐ

যেখানে দাঁড়িয়ে বিদূষক
দেখতে পায় রাজবেশ খুলে
শলমা-চুমকি মুকুট ইস্তক
নাটকটা কেমন পড়ছে ঝুলে,

কেননা সে দ্বিতীয় জীবন –
আরো একটা পদস্খলবিন্দু,
খানিকটা সুদূর, (তার কাছে)
অথচ কাছেই আছে কিন্তু!

আব ওদিকে মেয়েটা, তারো কি
প'ড়ে যায় না প্রেমের বাজার?
পরিত্যক্ত যৌবনের দিনে
হয় না সাবান ক্যানভাসার?

কিংবা সে আরোই মাখে রঙ,
গায়ে পড়ে, ছেলেরা পালায়;
হাসে-সে, হাসেই, তবু রাতে
ঘুম হয় না, কীসের জ্বালায়!

অথচ কাছেই আছে কিন্তু
আরো একটা গন্‌গনে জীবন,
আরো একটা পদস্খলবিন্দু
ক্রমাগত করে আক্রমণ।

সেখানে তেলকালি-মাখা মানুষ
খনিতে বয়লারে কারখানায়
পাগলা-ষাঁড সময়ের শিং
দুটি হাতে ধরে হার মানায়।

সেখানে দিনরাত রোদে জলে
ভ'রে উঠছে মাঠের ভাঁড়ার,
বর্গী এলে সোনার সে ধানে
সামনে তার মানুষ পাহাড।

সেখানে জীবন, নাকি ঘূর্ণি—
একটা দেশ, লোকজন, মানুষ
টাল খাচ্ছে উঠছে পডছে ঐ
যেন একটা সমুদ্র অথৈ।

সমুদ্র কি শিল্পরীতি শুধু?
মুখোমুখি প্রেমের আলাপ?
একটা দেশ, লোকজন, মানুষ—
ক্রমাগত বাড়ছে নিম্নচাপ।

ক্রমাগত নিম্নচাপ, হাওয়া
বইছে কি বইছে না, ইতস্তত
ঝাপটা আসে, যায়, ভাবে ওরা
বাঁচা গেল এবারকার মতো।

অথচ দিনগুলো যেন বিদ্যুৎ
হাত দিলেই ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌
স্নায়ু শিরা উন্মথিত, রাত্রি
জ্বালামুখী, কাঁসের গর্জন !

অথচ দিগন্তে কোণাকুণি
মেঘ, না ভ্রূকুটি, ওকি ঝঙ্কার
উড়ন্ত কেশব, সারাদেশে
লোকজন, মানুষ, একি তোলপাড়·

ভেঙে পড়ছে তরঙ্গে তরঙ্গ,
সমুদ্র কী রুদ্র বহুভঙ্গ,
স্বপ্ন অশ্রু ঘূর্ণি আর ত্রাসে
ওকে আসে দুরন্ত আকাশে·

২

জানতাম, জানতাম আমি এদিন আসছেই ; বলিনি কি,
বলিনি কি ঘরে ঘরে, দি : দিনে, একঘেয়ে কথাব
খেই ধরে বারে বারে ? ভেবে দেখ, একদিন বলবেই
লোকটা বলেছিল বটে, তোমরাও বলবে তা, আমি জানি,
যখন সেদিন আসবে, আসবেই, আমি তা জানি, এই
হওয়া-না হওয়ার দ্বন্দ্ব ফেটে পড়বে দ্রুত বিস্ফোরণে ।

তখন, সেদিন দেখো, আচমকার ওলট-পালটে
ছিটকে পড়ে কী রকম গোছানো সংসার, ভাঙে ছক ,
এই তুমি আপিসে যাচ্ছ, প্রেম করছ, অথবা আড্ডায়
বিবিধ খেদোক্তি ছুঁড়ে ফিরে আসছ পুনরাবর্তনে ,

আবার এই তুমি দেখ রাস্তাতেও নামছ ; পার্কে পার্কে
সভা হচ্ছে, গলা চড়ছে, প্রতিবাদ, জুলুম, আবার
পুনরাবর্তন···কিন্তু এক নয়, আরেকটা পর্দায়
মন সমারূঢ় ; তুমি বদলে যাও, বদলে যেতে থাকো,
তুমি বা তোমার মতো আর কেউ ; আরো অনেকেই,
বদলায়, বদলায়, তবু কেউ কেউ ভাবে এ রকমই
উড়ে চলবে দিন ; দেখ, আছড়ে পড়ে সে পাখি উড্ডান।

অর্থাৎ, আমি তো জানি, তুমিও কি জানো না, সময়
কী রকম স্বিরাচারী ? ফুল ফুটছে, ফল পাকছে, নদী
ফুঁসে উঠছে ক্ষ্যাপা ঢলে হঠাৎ, (হঠাৎ ?) দেখ ঐ
মাটির গভীরে, মূলে, ডালে ডালে, পাহাড়ে চূড়ায়
মেঘে ও তুষারে, সেকি অনিবার্য রীতি, দিনে দিনে
স্তরে স্তরে জ'মে, জ'মে, শুকনো পাতা, মরা সোতা, একি,
ফুঁসে উঠল ক্ষ্যাপা ঢলে , সময়ের দ্বিতীয় নিয়ম
হেসে উঠল কী বিষম স্থিরতার ঝুঁটি ধ'রে নেড়ে !

অথচ আমরা তো জানি,
গঙ্গাহৃদি বঙ্গ, জানি নাকি
বড় বেশিদিন আছি
স্থিবতার এ মন্দিরে ! জানি নাকি আজ
কালের বটের ঝুরি ভেঙেছে খিলান,
ভিতের ফাটলে সাপ,
অন্ধকারে পেঁচা ও বাদুড়,
জানি নাকি ঐ
গঙ্গার তরঙ্গ থেকে বড় বেশিদূর
মুছে গেছে জীবনের টান।

অথচ যে-কোনো গ্রাম
এক একটি সকালে স্বপ্ন—
এক একটি সকাল যেন
তাম্রশাসনের অনুলিপি।
ঐ তার আকাশ, ঐ মাইল মাইল মাঠ,
হঠাৎ অশথ, তাল, সবুজের পুঞ্জ, খড়ো চালা,
উঠোনে গৃহস্থ নিম, যুবতী ডালিম, ঝিঙে লতা ;
ওদিকে পুকুর, নাকি দিঘি, ঐ গলুইয়ে কাছিম ;
কলমির বেগুনি ফুলে সোনালি ফড়িং,
আর পায়ে চলা পথ, বাঁশ ঝাড়, আগাছার ঝোপ,
আকন্দ কি হাতিশুঁড়া, কন্টিকারি, কচু—
পাতার মখমলে তার সোনালি শিশির ;
এবং বাগান ঐ—জঙ্গলে জটিল
আম লিচু বকুলের গুলঞ্চের গলাগলি ভিড়ে
দপ করে হঠাৎ ওকি একথোবা অর্কিডের লাল ;
সমস্ত সকাল যেন চিত্রার্পিত, শুধু
মানুষেরই হৃদয়ে আকাল।

যাও না শবজির খেতে, নিড়ানির শিবাওঠা হাতে,
যাও না আমন-মাঠে লাঙলের পাকে পাকে, যাও
বোড়োর কাদায়, হাঁটুজলে পাট-ধোওয়া বিলে ;
ওঠো না হাটের নৌকো, গুণ টানো, যাও
চষো নদী জাল ফেলে, রাতে
ঘোরাও কুমোর চাকা, ঝুড়ি বাঁধো, বাটালি চালাও ;
শুধু দীর্ঘশ্বাস—তুমি, তুমি কেউ নও
তোমার হাতের মধ্যে আর কারো হাত,
তোমার ছায়ার পাশে আর কারো ছায়া ;
কোথায় দাখিলা-পরচা তহুরি-ত'সিল,
রেহানে হা-অন্ন দিনে আদালতে বোকা

তুমি খেতমজুরের হাজারে হাজির
আরো এক নামহীন সংখ্যা দিনে দিনে –
('ও বউ, কোথায় গেলি
ধানভানা শাকতোলা শেষে ?
পুকুরে, জলের তলে,
এলোচুলে একি ঘুম তোর !')
মা-মরা মেয়েটা নিয়ে একা
তুমি কি পাটকলে যাবে ?
তরাইয়ের বাগিচায় ?
কয়লা কুঠিতে ?
নাকি হাভাতের ঘরে টেনে নেবে যম ?
তুমি কি কখনো মনে ভেবেছিলে হয়েছ স্বাধীন ?
শুনেছিলে – বন্দেমাতরম্ !

শনশন হাওয়ার শব্দ। এক একটি হৃদয়
ভীষণ আর্তির মতো প্রশ্নময়। এক একটি প্রহর
স্তব্ধ জ্বালামুখী। তুমি যাও
যে-কোনো বয়লারে, ক্রেনে, টার্বাইনে, ব্লাস্ট ফার্নেসের
জ্বলন্ত হল্কায়, লেদে, হাইডেলে বা হাতুড়ির হাতে,
কয়েকটি প্রহর যেন বারেবারে আকাশে তাকায়।
কয়েকটি স্বপ্নের মধ্যে নিম্নচাপে হাওয়ার শন্‌শন
কেবলি ঝড়ের কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে তরঙ্গে তরঙ্গ
বলয়িত পরিধির বিস্ফারিত ঝাপটে হঠাৎ
কে জানে কখন জাগে আসমুদ্র হিমাদ্রি ঝন্‌ঝন্
গঙ্গাহৃদি কুলপ্লাবী বঙ্গ !

৩

প্রশ্নটা তাহলে এই :
সেদিনে আমি কোথায় ?
প্রশ্নটা তাহলে, সেকি
প্রতিধ্বনিময় : কোথায়, কোথায় !

একজন মানুষ, ভাবো,
আজ এই দিনে
বেঁচে আছে, একজন মানুষ
বেচে, ভালোবাসে দেশ,
অর্থাৎ জীবন, ভাবো,
ঘরে ঘরে, কাছে দূরে
কতো না সংসার, স্মৃতি,
কতো না বন্ধন, ঘুরে ঘুরে
একজন মানুষ বাঁচে
দিনে দিনে, বছরে বছর,
বুকে তার বেঁধানো অঙ্কুশ,
ভাষা তার আত্মবিভাজনে,
একজন মানুষ, ভাবো,
চেতনার আঁচে
বাঁচে, একজন মানুষ
দিনে দিনে, বছরে বছর
যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে, বানে,
দাঙ্গায়, উদ্বাস্তু-স্রোতে,
জীবনের আর্ত নির্বীজনে,
আজ এই দিনে,
একজন মানুষ, সে তো জানে –
বুকের পাথর ঠেলে
জীবনেরই লাফ দিয়ে ওঠা ;

আর সেই ঋণশোধে, সেই
উন্মুলিত ছিন্নভিন্ন মনে
প্রশ্নটা তবুও, সেকি এই :
সেদিনে আমি কোথায় ?   আমি ?

আমি কলকাতায় আছি ,
পাঁচফুট ছ'ইঞ্চি এই শরীর
অপটু, অকেজো, ন্যুব্জ ,
কতো না বিরোধী ভয়ে মন
অপদস্থ , আমি ব্যতিব্যস্ত
স্নায়ুর পীড়নে, দ্বন্দ্বে,
চরিত্রহননে , আমি আ'ছি
চৌকোণা ইটের এই খাঁচায় ,
ছটফট ছটফট উদয়াস্ত
হাড়হদ্দ জেনেশুনে, তবু,
বেঁচে আছি সে কোন বাঁচায় ?

মনেরও আড়ালে মন,
আমি তার প্রত্ন ঢেঁকিশালে
ভাঙিনি কি দিনে দিনে ?
গুঁড়ো হই নি, ঝরি নি হাওয়ায় ?
ঢুকে যাইনি রেণু রেণু
মানুষের ঘরে, মনে,
শতকে শতকে, আজ
এখনি এখানে ?
জন্ম জন্ম, লোক-পরম্পরা
আমরাই তো বীজধানে আশা
নিয়ত রোপিত ; আমি,
ত্রিকাল আমারই বুকে ধরা,

একটা দেশ লোকজন মানুষ,
আমি বাঁচি তারই ভালোবাসা।

ভালোবাসা, বুঝেছ কি কথাটা দাঁড়াল কী রকম ?
খড় কাদা ছেনে, ধরো, যে-মানুষ প্রতিমা বানায়,
শিশুর মুঠিতে পায় জীবনের অনন্ত বেতন,
ঘাসের সঘন বুকে ঘাসপোকা যেমন নরম
যার প্রীতি সে রকম জলরাশি মাছেদের গা'য়,
চিলের তাড়ায় ত্রস্ত চড়ুইয়ের বুকে যার মন
অগাধ বাঁচার সাধে রক্তপাতে হ'য়েছে জখম,
সে কী চায়, সে কী ভাবে, এ জীবন যেদিন দাঁড়ায়
হঠাৎ স্তম্ভের থেকে হুংকারিত নৃসিংহ যেমন ?

না, আমি দেব না ফাঁকি,
আমি জানি জীবনের দাম।
আনো শত সূর্যের আকাশ,
তারাপুঞ্জ, কোটি নীহারিকা,
তবু দীপ্তি হবে না সমান—
একবিন্দু ছুঁচের ডগায়
রক্তকণা যতো জ্যোতিষ্মান্!

তবুও সময়, আমি জানি,
সময়েরই অনুবিদারণে
পরস্পর তাপবিকীরণে
ছুঁড়ে দেয় শাপদগ্ধ হানি।

সে মুহূর্তে হৃদয় আমার,
আমি জীবনেরই শরণার্থী,
কী থাকে আমার, শুধু প্রশ্ন,

ভিতরে বাহিরে শুধু ঘূর্ণি,
আমি কবি, কী থাকে আমার,
জীবনেরই পাশে আমি আর্তি,
নির্বাচিত বীজের তোলপাড়।

৪

তোলপাড়, কথাটা এই, বদলাচ্ছে তোমারও অন্তঃসার,
নড়ে যাচ্ছে দাড়িপাল্লা, তুলামূল্য ভাঙছে তুলকালাম,
রোদ্দুরে, মাটির টানে, বীজে ফাটছে খোলস তোমার,
যেন গুরুচণ্ডালীর মুখে ছিঁড়ছে নিষিদ্ধ লাগাম।

তোলপাড়, কথাটা এই, সময় ধুনুরী যেন, তার
আদিম আঘাতে দেখ আঁশে আঁশে ফেঁশা হচ্ছে এমন,
তুমি একটা লোক, নাকি হাজারবার, হাজার মানুষ
নিয়ত বুকের মধ্যে ঢুকে অসাধ্যসাধন,
তুমি একা, যুগপৎ চতুর্দিকে, হাজারে হাজার—
রক্তের মৃণালে খোঁজো প্রাণপদ্মে এ'বার ' শুরু।

কে জানে এ কোন তৃষ্ণা, কার প্রশ্ন, কী আছে ভূমিকা
তুমি শুধু ভগ্নদূত? দেখে যাবে? রাজার দরবারে
বলে যাবে, দূরে, স্থির, বর্ণনার সাজানো পুতুল?
নাকি গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জেগে উঠবে অস্ত্র ঝনৎকারে
তোমারই হৃদয়ে, ছিঁড়বে স্থিতস্বার্থ ভাগ্য আর টাকা—
শূন্যতার যোগফল অঙ্কে অঙ্কে যেদিনে উশুল।

আমি তো বলেছি, আসছে, বলিনি কি সময় আসন্ন?
দুরন্ত বলয় ঐ ছোটো হচ্ছে, ছোটো হচ্ছে ক্রমে,

·গায়ে কি লাগছে না আঁচ? তবু দেখ, অন্ধ মতিচ্ছন্ন
অনেকেই ভুলে থাকছি জীবনের দ্বিতীয় নিয়মে ;
ভাবছি না— আজকের দিনটা, ঘরবাড়ি প্রতিষ্ঠান সংঘ ;
আর সেই লোকটা, সেই-যে ব্যাশানে বাজারে নাজেহাল ;
আর সেই ছেলে, সেই-যে তুচ্ছ হচ্ছে, আত্মায় উলঙ্গ ;
আর সেই মেয়ে, সেই-যে পরিত্যক্ত, গালে মাখছে লাল ;
এবং যে কোনো গ্রামে তাম্রশাসনের অনুলিপি
হারানো কৃষাণ সেই, যারা যাচ্ছে পাটকলে ব্যারাকে ,
এবং বয়লারে লেদে পাক খাচ্ছে প্রাচীনা পৃথিবী,
ঘামে অনাহারে তাপে পাশ ফিরছে সময়ের ডাকে ,
দেখছি না জীবন সেই, একটা দেশ লোকজন কেমন
প্রশ্নের বলয়ে ঘিরছে, খসে পড়েছে পুরনো প্রসঙ্গ ;
এবং মানুষ, দেখ,হাত দিলেই ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ ,
এই জন্ম, জন্মভূমি, একি দিন, কূলপ্লাবী বঙ্গ ?

না, তুমি প্রোথিত , দেখ বৃক্ষটি যেমন
মাটিতে, সময়ে তুমি প্রায় সে-রকম।
অথবা মাটিও তার মৌল রসায়ন
বদলিয়ে যেমন গাছে বিচিত্র পেখম,
তোমারও ভিতরে কাল আজি ন'রে পেশ,
(গোষ্পদে আকাশ !) কিংবা যা বলেছি আগে,
বিপুল বিরোধী স্রোতে আর্ত এই দেশ
তোমারই হৃদয়ে গোটা যুদ্ধভূমি জাগে ।
তখন, এই তুমি, হয়তো সামান্য মানুষ,
ভাঙছ, ভেঙে যাচ্ছ দেখ হাজার [illegible]ত্রে ,
নিজেকে ছড়াচ্ছ, মিশছ, ছিটকে পড়ছ, ঐ
সময়ের উদূখলে শস্য, নাকি খসে পড়ছ তুষ ?
আবার যন্ত্রণা-বেঁধা ছুটন্ত মুহূর্ত
তুমিই তো দেখছ মনে, চেতনার অন্য চলচ্চিত্রে

তখন, কলকাতা এই, বাংলাদেশ, নাকি এ সমুদ্র,
তরঙ্গে তরঙ্গ, নাকি মানুষে মানুষ,
হঠাৎ কী করে হ্রেষা শঙ্খধ্বনি, বৃংহিত, গর্জন,
তোমারই বুকের মধ্যে আর্তির শিখরে স্বতঃস্ফূর্ত
রুদ্র অক্ষৌহিনী, সেকি সময়ের অনুবিদারণ,
ফেটে পড়ল যুদ্ধক্ষেত্র, নাকি কুরুক্ষেত্র —
এ জীবন তোলপাড়, তোলপাড় —

তাহলে তোলপাড়, ঐ
কুরুক্ষেত্র, অথবা অরণ্য —
শত বর্শাফলা, ধ্বজা, উড়ন্ত নিশান।
যে লোকটা ওখানে, প্রৌঢ়, যুদ্ধ করছে বীর,
সেকি ভীষ্ম, সেকি তুমি, কিন্তু কার জন্য
(প্রশ্নে দোলাচল, বৃত, হৃদয়ে অস্থির।)
কার জন্য প্রাণ দিয়ে, জয় খুঁজছ কার ?

তখন, এই তুমি, ও কে
অভিমন্যু, রক্ত ঝরছে গায়ে,
এত ভালোবাসা, আশা, স্বপ্ন ঐ চোখে,
তবু কোন চক্রান্তের দায়ে
সাতটি নেকড়ের ফাঁদে নিরস্ত্র যৌবন,
ছিন্নজবা হৃদ্‌পিণ্ডের আত্মবলিদানে
মরীয়া এমন!

এবং শিখণ্ডী তুমি, শকুনি, বা ভীত জয়দ্রথ —
প্রতিহিংসা-ঈর্ষা-রিরংসায়
সময়ের মূর্ত অনাচার।
আবার তুমিই কর্ণ, নিয়তিতাড়িত,
অথচ হৃদয়ে তবু জ্বলে অগ্নিশিখা,
পুরুষের দৃপ্ত স্বাধিকার।

তুমি শত পদাতিক, অনামা সেনানী,
উৎক্ষিপ্ত দুহাত, ছুটছ, পিঠে-বেঁধা তীর,
তুমি দ্রুত পিছনের মত্ত পদশব্দ,
কিংবা ওৎপাতা মৃত্যু, সুযোগসন্ধানী ;
আবার তোমারই বুকে সুভদ্রা কি মাতা গান্ধারীর
হাজার পুত্রের শোকে স্তব্ধ
সারাদেশ, আমি তাও জানি !

তুমি কি তখন বুঝবে অর্জুনের গভীর বিষাদ—
যুদ্ধে সমাগত রণস্থলে
দুটি যুযুধান শ্রেণী, সবাই সৈনিক,
হাস্যময়, শস্ত্রপাণি, স্থির,
যেন দুটি সমুদ্রের ঢেউ মন্ত্রবলে
সংহত সকল বেগ, মুখোমুখি, স্থাণু,
অথচ মুহূর্তে ক্ষিপ্ত ধাবিত সংঘাত—
ছিটকাবে কোথায় কার অণুপরমাণু।
তখন, অর্জুন তুমি, তবু কেন বৃহন্নলা ক্লীব
তোমারও রক্তের স্রোতে ? —হাতে আর ওঠে না গাণ্ডীব।

এবং তোমারই বুকে ঐ
বেজে কি ওঠে না পাঞ্চজন্য,
জাগে নাকি কৃষ্ণ, সেই পুরুষপ্রধান
বলে না—হে বীর ওঠো,
সময় জিঘাংসু আজ বন্য,
তোমারই বুকের দিকে নখর শাণায়
উত্তিষ্ঠিত, হে বীর মাভৈঃ,
এ অশ্রু কি তোমাকে মানায়,
ধনুকের ছিলা দাও টান !

এবং তখন সেই কুরুক্ষেত্রে জীবনের দ্বিতীয় নিয়ম
ছিন্নমস্তা সময়ের অস্ত্রে অস্ত্রে দেখ খরশাণ,

দেখ দিনেদিনে শুধু ক্রোধ, হিংসা, চক্রান্ত নির্মম,
আর আত্মদান, হানি, আর শেষে জয়ের বিষাণ !

এবং তখন সেই ধ্বংসস্তূপে মৃত পরিজনে
স্মরণের দিনে তুমি, তুমিও কি জলাঞ্জলি দিতে
কেঁদে উঠবে, যুধিষ্ঠির ? - প্রশ্ন করবে খেদরিক্ত মনে :
কী লাভ শ্মশানে বেঁচে, নষ্টস্মৃতি শূন্য পৃথিবীকে ?

আর,বেদব্যাস তুমি, তখনি কি উদ্ধত তর্জনী
তোমারই হৃদয়ে বলবে তিরস্কারী সে অনুশাসন -
জয়প্রার্থী একদিন তোলোনি কি দৃপ্ত রণধ্বনি ?
বিজয়ী এখন, শোকে এ সারল্য বল কী রাবণ ?

ভুলেছ কি বুকে সেই জাঁতাচাপা আর্ত দিবারাত্রি ?
ভুলেছ কি আসমুদ্র ডেকে আনলে কোটি পদাতিক ?
কেউ তারা মৃত, কেউ বিকলাঙ্গ, সবার ঘরে আর্তি ,
আর তুমি শোকে শ্লোকে নীতি নিয়ে মেটাচ্ছ বাতিক ?

কেন ঐ হাহাকার ? সময় কি মানে আত্মক্রীড়া ?
পোড়ো-ভিটে ঝোপে-ঝাড়ে হতাশার নিষ্ফলা আঁধার ।
তুমি কি নামবে না পথে ? রোদে-ঘামে জানবে না চাষীরা
বাঁজা মাঠে কী নিয়মে বীজক্ষেত করে আবিষ্কার ?

.. এবং তখনি তুমি চমকে হয়তো জীবনের গ্রন্থি
খুঁজে ফিরবে শ্রমে-জলে, স্বপ্ন ছেনে গড়ে তুলবে প্রাণ ।
জানি, সে এখন নয় । - আজ শুধু সময়ের টান
নাড়িতে শিরায় । আজ ফুলে উঠছে তীক্ষ্ণ যুগসন্ধি ।

৫

এ একটা অস্থির দিন,
এ একটা উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধি।
চতুর্দিকে তুলকালাম,
কেবলি যায় যায় প্রতিধ্বনি।
অথচ কেন যে যায়, যেতে থাকে, পূর্বাপরহীন
কেন ছেঁড়ে সময়ের গ্রন্থি ?
একি শুধু ভ্রান্ত উচাটন ?
একি নগ্ন আতিশয্যে যৌবনের নেশার উল্লাস ?
ঐযে অনন্যযাত্রা
পুত্রকন্যা
দ্বিতীয় জীবন,
ঐ আমাদেরই ঘরে কতো না কিশোর—
দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে,
ওরা তো উঠেছে বেড়ে
আমাদেরই অন্নে
স্বপ্নে
বুকের ভিতর,
কেন মৃত্যু ছিনিয়ে নিতে ভাঙে ওরা গণ্ডি ?
আগুনে পাথরে দ্রোহে ওঠে ঐ হেসে।
একি শুধু প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয়ে মরীয়া বিলাস ?
একি ছেলেখেলা শুধু, একি
নির্মম, নিমন, মূঢ়,
আত্মপরিহাস ?
তাহলে এখানে এস।
আমার পায়ের
মাটিতে দাঁড়াও, দেখ
এ একটা দিনের স্নায়ুকেন্দ্রে
কী তুমুল তোলপাড়!

তাহলে এখানে এস,
এক-একটা ধারণা হাত দিয়ে
তুলামূল্যে নেড়ে দেখ।
এক-একটা বিধান
কালাতিক্রমণদুষ্ট ফসিলের মতো
এ জীবন করে যাদুঘর।
তাহলে এখানে এস,
প্রতিষ্ঠান
সংঘ
দেখ ঐ [illegible]য়ে
মৃত
জরদ্গব
আত্মার পচনে আজ কেমন উলঙ্গ

অচল বিংশতি এই!
দেশে ও বিদেশে
আজ শুধু পিছটান,
শুধু চাপা দেওয়া—
যৌন অসুখের মতো গোপন বিকার।
অথচ চেতনাকেন্দ্রে শতাব্দীর শেষে
অণুর তড়িৎনৃত্য,
আকাশের পারে মহাকাশ
একই সঙ্গে ছোঁয়নিকি এসে?

সময় দুদিকে। ঐ
পিছনে তোমার
ক'কোটি বৎসর, নাকি তরঙ্গে তরঙ্গ—
অন্ধকারে ঢেউ ওঠে পড়ে;
জড়ের স্পন্দন থেকে অ্যামিবার উপকূল ছুঁয়ে

কতো না ঘটনা, কতো মগ্ন প্রবর্তনা
মায়ামূর্তি ধরে ;
আর তাই উদ্ভিদে ও সরীসৃপে,
ম্যামথে, মানুষে,
পুরনো প্রস্তর দিনে, অগ্নি-আবিষ্কারে
এ চেতনা নিত্য স্বয়ংবৃত ,
আর তাই হিমযুগে,
তুষারে, প্লাবনে,
শতাব্দীর পলিতে শতাব্দী
আগুনে ও ধনুর্বাণে,
ইস্পাতে ও অণুবিদারণে
ঢেউয়ে ঢেউ নিয়ত উত্থিত ,
আর তাই মনীষার এ দৃপ্ত উৎসার—
সেকি আর থাকে জীবন্মৃত ?
সময় তুদিকে। ঐ সম্মুখে তোমার
অনাগত রাশিচক্রে ঘুরে ঘুরে নাচে মহাকাল,
দৃশ্যে, দৃশ্যান্তরে
দিনে দিনে,
ধারণার বিস্ফোরণে
চেতনার ওলটপালটে
খোলে ঐ আড়ালের ওপারে আড়াল.
তারই ঢেউ জীবনের তটে,
দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে,
তরঙ্গের শিখরে তরঙ্গ—
সেকি আর মানে কোনো বাঁধ ?
অনন্ত যৌবন তার রুদ্র, বহুভঙ্গ,
আগুনে পাথরে দ্রোহে ওঠে আজ হেসে,
আদিগন্ত কোটি কোটি হাত
ছুঁড়ে ফেলে মৃত যতো প্রতিষ্ঠান, সংঘ।
তারই ঢেউ বুকে লাগল এসে।

গঙ্গাহৃদি বঙ্গ, জানি নাকি
ধ্বংসস্তূপে হাহাকার, অশ্রু আর ঘৃণা ?
এক-একটা সময় তবু আসে—
শিখরে শিখর, যেন সংঘর্ষে সংঘর্ষ, ?
বেজে কি ওঠে না অগ্নিবীণা ?

সে একটা অস্থিব দিন,
আমি জানি নাকি ?
সে একটা উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধি।
তবু, আমি স্বপ্ন,
আমি নিয়ত নিমাণ,
আগুনে পাথবে দ্রোহে খুঁজি শুধু সময়েব গ্রন্থি
শতাব্দীব শেষে, কিংবা কয়েক শতাব্দী
পাব হ'য়ে মানবযাত্রাব
আলো-অন্ধকাবে, ঝড়ে, রুদ্র বহুভঙ্গ,
আমি কবি, কী থাকে আমাব,
এই জন্ম, জন্মভূমি, এই
চেতনাবই বিস্ফোবণে তবঙ্গে তরঙ্গে—
মানুষে মানুষ, প্রশ্ন, দিগন্ত উৎসাব ॥

ভি য়ে ত না ম

ম. কা. স ৪

১

যেখানে যা কিছু চলে,
যেখানে যা কিছু জাগে, বেঁচে ওঠে, নড়ে—
পূবে বা পশ্চিমে যাও
ইতিহাসে, অথবা হৃদয়ে,
উত্তরে দক্ষিণে যাও
শত জাতি অধ্যুষিত ভূগোলের পলিতে, বা মনে,
যেখানে যা কিছু ভাঙে, টাল খায়, বাঁকে.
যেখানে যা কিছু মাথা তোলে—
একটা পথ কেবলি সম্মুখে,
একটা পথ মানুষের রক্তের ভিতরে
ক্রমাগত জীবনেরই দিকে।

তুমি কি শহরে, এই
কলকাতার গলিতে বা উদ্বাস্তু ডেরায় ?
চাকুরে কি ঠিকেদার, ছাত্র কি দোকানী ?
তুমি কি গ্রামের চাষী, সবুজ বাংলার
লাঙলের মাঠে ? কুলি চা-বাগানে ? কলের মজুর ?
নাকি তুমি পাহাড়ের অরণ্যের হাজারিবাগের
আদিবাসী, কাজ করো কোদালে কডুলে ?
তুমি কি পাটনার গাঁয়ে অড়হর মকাইয়ের ক্ষেতে,
নাকি আগ্রা-অযোধ্যার আঁটি-বাঁধা আখ
গরুর গাড়িতে তুলে তুমি চলো স্টেশনের পথে,
তুমি আছো রাজস্থানে জলতোলা দীঘার পাড়ে.
রঙিন ঘাঘরায়, মাজা পিতলের ঘটে ;
আবার দক্ষিণে তুমি, কর্ণাটকে তামিলে মহান
মন্দিরের গোপুরমে, মাঠে, ঘামে, যন্ত্রের চাকায়
জীবন সংগ্রামে, দূর মালাবারে ঐ

নারিকেল-উপকূলে জেলের ডিঙিতে,
দুঃসাহসী মত্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
মানুষ, মানুষ, তুমি জাগো
আসমুদ্র হিমাদ্রি ; এবং

যে তুমি আদিম, কালো আফ্রিকার প্রাণ,
অপমানে পদাঘাতে বুকের জখমে
কঙ্গো কিম্বা রোডেশিয়া আঙ্গোলা গিনিতে,
কোকো ক্ষেতে, সোনার খনিতে, ঘাস বনে,
হাতির দাঁতের খোঁজে, সফরির অরণ্যে উধাও,
সিংহের গর্জনে, দ্রুত জিরাফের পথে,
জাম্বেসীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
পাহাড়ে, মরুতে,
ডুম ডুম ঢাকবাজা গাঢ় অন্ধকারে,
দিনের শাণিত শত বর্শার ফলায়
শতাব্দীর শিকলে জেগে-ওঠা তুমি ;
অথবা যে-তুমি এ লাতিন মার্কিন,
মায়া বা আজটেক, সূর্য মন্দিরে উধাও
ইনকার সোনার খোঁজে, ভগ্নস্তূপে শত লুঠেরার
মেক্সিকো বা বলিভিয়া, পেরু বা ব্রেজিলে,
আণ্ডিস পাহাড়ে, ক্ষ্যাপা আমাজনে,
টিন বা তামার খনি, কফি ক্ষেতে,
তুলোর বাগানে, কলে, দ্রুত বিদ্রোহের
চোয়ালে চোয়াল, খাড়া ; যে-তুমি এখন

উত্তরে প্রাসাদপুরী লিঙ্কনের দেশে
সোনা আর মদ আর ক্যাবারে নাচের
উল্লোল হাসির পাশে হার্লেমে সজাগ
মানুষেরই সৎভাই, ঘন অন্ধকারে
অগ্নিময় চোখ ; দুটি চোখ

যে-তুমি প্রায়ারি মাঠে, টেনেসির উপত্যকা পথে,
মিসিসিপি, মিসুরির স্টীমারে, বনের
কাঠকাটা ঘরে, তুলো আলু ও তামাক
মাটির অগাধ শস্য ঘরে তুলে, ঐ
জলবিদ্যুতের কেন্দ্রে, যন্ত্রের মুঠিতে
অনন্ত পণ্যের ভারে ঘর্ঘর, ঘর্ঘর·
বিনিদ্র বাহ্নির দাহে, ঘামে ও পীড়নে
যে-তুমি, মানুষ, কোটি রণতরী-বোমারু-বারুদ
যে-তুমি মৃত্যুর পাঞ্জা দুহাতে ছাড়িয়ে মুখোমুখি
ব'লে ওঠো, মানি না শাসন,

একটা পথ তোমারই সম্মুখে···
তোমারই বুকের মধ্যে, ধমনীশিরায়,
শত পূর্বপুরুষের স্মৃতির বাঁধনে,
পৃথিবীর মাঠজল-গাছগাছালির
পরিচিত প্রেমে, শ্রমে, সংঘর্ষ চূড়ায়,
অশ্রুর লবণে, ক্রোধে, হাঁড়িকাঠে মাথা
রক্তের বন্যায়, কোটি জেগে-ওঠা ঘরে
একটা পথ টাল খায়, বাঁকে,
একটা পথ মানুষেরই স্বপ্নের ভিতরে –
পূবে বা পশ্চিমে যাও
ইতিহাসে, অথবা হৃদয়ে
উত্তরে দক্ষিণে যাও
শত জাতি-অধ্যুষিত ভূগোলের পলিতে বা মনে,
যেখানে যা কিছু চলে
একটা পথ কেবলি সম্মুখে,
যেন গোটা পৃথিবীরই গতির শপথ –
বাত্রিফাটা আকাশের উষার শিখরে
স্বাগত, স্বাধীন,
ভিয়েতনাম, জাগে ভিয়েতনাম!

২

ভিয়েতনাম,
পৃথিবী তোমারই পথে,
স্বপ্ন তুমি নয়নাভিরাম!
তবু ও' কে বুকের উপর
জগদ্দল স্ফীত অহমিকা?
বারুদে বোমায় ও' কে হানে রসাতল?
যন্ত্রণা কি পদানত ভয়ের জগতে
আঁকে বিভীষিকা?
তুমি জানো জীবনের দাম!
তোমার মাটির বুকে মমতা অপার,
মৃত্যুকে দুপায়ে দলে ভেঙেছ শিকল
তুমি বারম্বার!

মনে পড়ে, চম্পা তুমি
সমুদ্রের দূর উপকূলে!
মনে পড়ে, সেদিনের স্বর্বর্ণভূমির
দ্বীপময় ভারতের, শ্যাম-কম্বোজের
বাণিজ্যবায়ুর আনাগোনা।
মনে পড়ে, তোমারই মাটিতে
সমুদ্রের লোনা অভিযানে
অশ্রু আর স্বপ্ন আর শস্যের সাড়ায়
আমাদেরই প্রেম হল সোনা।

হাজার বছর তাই সূর্যোদয়ে জীবনের মূলে
নবউজ্জীবন।
হাজার বছর তাই বংশ-বংশ ধরে দিনে দিনে
তুমি হলে মুক্ত তলোয়ার।
সেদিন মন্দিরে তুমি, চৈত্যে ও বিহারে,
শতাব্দীর দূর উপকূলে

দাঁড়ালে পাহাড়, নাকি মানুষেরই মনে
পাহাড়ের প্রতিজ্ঞা অপার।
সেদিন ওরা কে ? ঐ কাতারে কাতারে
অরণ্যপ্রান্তর ভেঙে মত্ত হানাদার ?
এল কি কুবলাই খাঁর দর্পিত বাহিনী ?
সেদিন ওরা কে ? ঐ সমুদ্রশকুন
এল কি আগ্রাসী ক্ষুধা বণিকের ধূর্ত ছলনায় ?
চম্পা, তুমি স্বাধীন স্বরাট,
পিষে দিলে লুব্ধ যতো লুঠেরার হাত।
সেদিন মাঠে ও ঘরে, বন্দরে ও সেনানী শিবিরে
অযুত হৃদয়ে তাই এক প্রতিধ্বনি –
এদেশ আমার !

আর তাই আছো তুমি জাতকে-গাথায়,
তুমি শত কাহিনীর প্রত্ন শিলালিপি,
তোমারই মহিমা কথা-সরিৎসাগর
তুমি ঘন অন্ধকারে স্থির দীপশিখা।
আর তাই দূরদেশ, রোমে, নতজানু
টলেমিরও ইতিহাস তোমারই চারণ –
তোমারই ললাটে, চম্পা, আঁকে জয়টীকা।
মৃত্যুকে দুপায়ে দ'লে হাজার বছর
কোন ভয় টলাবে এখন ?
কোন যন্ত্রণার স্নায়ু আঁকে বিভীষিকা ?

জানি, জানি, এদিনের ও ক্রূর পটভূমি।
জানি, জলদস্যুতার সুযোগ-সন্ধানী
ফরাসী জাপানী, আব জাপান ফরাসী,
কুমিরের শোকে সেই হাত-বদলের
ফরাসী মার্কিন, আর, মার্কিন···মার্কিন!

এক দেশ, বুকে তবু ওঠে কাঁটাতার,
এক দেশ, খড়্গো তবু দ্বিখণ্ডিত, ঐ
এক দেশ, উত্তর···দক্ষিণ।

আমি জানি, যন্ত্রণা কি তার!
আমি যে বাংলার কবি,
আমারও তো একই গ্রাম, একই চালাঘর,
চাষের লাঙলে আমি একই মাঠে মাঠে
টোগা প'রে বীজধানে চাষী, জাল ফেলে
মাছ ধরি, বাঁক কাঁধে গিয়েছি বাজারে,
কলাঝোপ, বাঁশঝাড়, বেত, নারিকেলে
সাজানো দিগন্তে নদী, মহিষের পিঠে
চলেছি আমিও কতো উদাসী রাখাল.
আবার আমারও ঘরে দাদনের শাপে
দুমুঠো ভাতের থালা ভাঙেনি কি বছর বছর ?
বাংলার আকাশ থেকে দূর ভিয়েতনামে
একই আমি গাঁয়ের মানুষ,
আমারও তো পুড়ে যায় ঘর,
আমারও তো জীবনে পাঁচিল।
পূবে ও পশ্চিমে আমি, উন্মূলিত ফিরি ভিটেছাড়া
উদ্বাস্তু শিবির থেকে আরো রিক্ত আর্ত হাহাকারে;
আমিও তো বানপুরে পোত্রেপোলে আর
বে-মানুষ সীমান্তের আগাছার মাঠে
অশ্রু দিয়ে শুধেছি সে ঋণ;
পূবে ও পশ্চিমে আমি, আমি জানি নাকি
বুকের ভিতরে ঐ বেঁধানো সঙিন,
কতো রক্ত ঢেলে আজ দূর ভিয়েতনামে
ফরাসী মার্কিন, আর, মার্কিন···মার্কিন,
এক দেশ দ্বিখণ্ডিত, শকুনি-পাশায়
এক দেশ উত্তর···দক্ষিণ!

আমি জানি পীড়নেরও সুদীর্ঘ তালিকা।
দিনেরাতে কেবলি আগুন,
দিনেরাতে শুধু বিস্ফোরণ।
মানুষের মমতার সব আকুলতা
উলঙ্গ দুহাতে ছিঁড়ে বন্যতার নৃশংস বিকার
দিনেরাতে করে আক্রমণ।
প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে
অরণ্যে পর্বতে মাঠে নদীতে ও ঘরে
ফেরে শুধু বীভৎস সন্ত্রাস,
মৃত্যু ও ভয়ের জালে
গুঁড়ি মেরে প্রহরে প্রহরে
স্নায়ুর উপরে হাত রেখে
ধীরে ধীরে টানে যেন ফাঁস।
যেন দূর মধ্যযুগে অন্ধকার গুহার ভিতর
বিকৃত পিশাচসিদ্ধ মারণের গবেষণাগারে
প্রতিদিন ক্রূরতর খোঁজে উপচার।
আর তাই নাপামের তরল আগুন
পোড়ায় পুরুষ-হাত, নারীর হৃদয়, আর
কচিকাঁচা বাচ্চাদের আদরের গাল।
আর তাই ধানক্ষেতে হাঁটুজলে মেয়ে—
পিছনে দাউদাউ গ্রাম, উলঙ্গ বালিকা,
দুচোখে বিশ্বের ঘৃণা, কাঁদে অসহায়।

আমি জানি সব ইতিহাস।
যেন এক নিপুণ জহ্লাদ
মানুষের শরীরের শেষ সহনতা
কতোদূর মেপে তার পিশাচ উল্লাস।
জীবন্ত শরীর থেকে ছালখোলে বুকে হাঁটু রেখে;
দুজনে দুহাত ধরে
আর কেউ জিঘাংসু, করাল,

পেটের ভিতর বেঁধে
ধীরে, অতি ধীরে
শাণিত ছুরির বাঁকা ফলা ,
স্বামী আর ছেলেমেয়ে
পিছমোড়া, লুটোনো উঠোনে,
তাদেরই চোখের সামনে জায়া ও জননী
বিবস্ত্র পরুষ-হাতে, দলবদ্ধ কামেব শিকাব ,
যাবা ভালোবাসে দেশ,
মাটি ও মানুষ,
পায়ে দড়ি বেঁধে, গাছে, মাথাটা ঝুলিয়ে
বেঁধেছে, বাদুড় যেন, আর তারই নিচে
জ্বেলেছে চিতার মতো জ্বলন্ত নরক ,
কোমরে শিকল বেধে
একদল মুক্তিপ্রাণ ধৃত গেরিলাকে
জীবিত, সজ্ঞান,
একে একে ছুঁড়ে দিয়ে সদ্যখোঁড়া ব্যাদিত কববে
ঝুপঝাপ মাটি ফেলে, ঝুপঝাপ মাটি,
যতক্ষণ না থামে গলার
দমফাটা প্রতিবাদ, মাটির তলায়
চাপা পড়ে মানুষের স্বর ।

আমি জানি যন্ত্রণার দীর্ঘ বিভীষিকা ।
তবু আসে সে দিব্য প্রহর,
মাটিচাপা মানুষের শ্বাসরুদ্ধ ভাষা
অযুত বীজের মতো ফেটে পড়ে ঐ
মানুষেরই বুকের ভিতর ,
তবু জাগে তীক্ষ্ণ দৃপ্ত আশা
লাখো লাখো নারী ও পুরুষ
লাখো লাখো কিশোরী কিশোর —
গুণটানা ধনুকের প্রতিজ্ঞা, মাভৈঃ,

জেগে ওঠে ঘরে ঘরে, মাঠে আর বনে,
জানের বদলে জান, বলে ওঠে এদেশ আমার।
আমরা হবই হব জয়ী।
আর তাই মেকঙের অববাহিকায়—
তে এনগুয়েনে—দিনে দিনে
সারাদেশ, মালভূমি, পাহাড়ে ও গাঁয়ে
জাগেন হাজার বীর—সাও নাম, কোয়াঙ,
জাগেন ত্রান-দিন-মিন, এনগুয়েন হান চুঙ—
কী তীব্র সাধনা সেই—আদিবাসী, গাঁয়ের মানুষ
দিনে দিনে কাছে আসে, দিনে দিনে গড়ে
জীবনের পথ নিরঙ্কুশ।
যন্ত্রণা কীসের বিভীষিকা ?
খসে পড়ে কৃষ্ণ যবনিকা !

এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ,
ভিয়েতনাম, ধন্য বটে তুমি।
তোমার পাহাড় নদী অরণ্য গভীর—
তাদেরও যে তুমি জন্মভূমি !
তাইতো তোমার যতো মুক্তিসেনা যে পথে পথিক
তোমার টিলা ও খাঁড়ি বনভূমি আজ
তাদেরই শরিক।
গাছেরা তাদের বন্ধু, পাহাড় তাদের
দুর্গমের রচে অন্তরাল,
পদে পদে বাধা ওরা, মৃত্যু পদে পদে,
পাশাপাশি লড়ে ওরা মানুষের মতো
উন্নত, বিশাল।
তাইতো নৃশংস বোমা দিনে রাতে পাহাড়ে আগুন,
তাইতো নদীর জলে ঢেলে দেয় বিষ,

তাই তেজস্ক্রিয় বাষ্পে সারা দেশ জুড়ে
পাতাঝরা গাছেরা কঙ্কাল।

এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ
নিষ্ঠুরতা হিংস্র, অবাবণ।
মাঝে মাঝে ভাবি, ভিয়েতনাম
তুমি কোনো দেশ, নাকি
সীমায় সীমায বাঁধা মাঠ নদী বন
মারণেবই নগ্ন ক্রীডাভূমি ?
তোমার সমুদ্রতীবে, ধানক্ষেতে, পাহাডে টিলায়
কোন মূল্যে বেঁচে আছ তুমি ?
তোমাব প্রতিটি গ্রামে প্রতিদিন বোমারু কামান
তোমাব প্রতিটি ঘবে ঘুমন্ত শিশুবা
উড়ন্ত বুলেটে ঝাঁঝবা লুটেছে মাটিতে,
পথে পথে কেঁদেছে জননী।
প্রতিটি সকাল সন্ধ্যা বক্ত ঢে'ল তবু
তুমি জযধ্বনি।

হয়তো কে জানে ওবা আত্মপরাজিত
যখনি নেমেছে ঐ মাটিতে তোমাব।
একদিন নুবেনবার্গে ন্যাযদণ্ড হাতে
বসেনি কি বিচাবে ওরাই ?
অথচ বিবেকীবাণী থেমে না যেতেই
একই হিংস্র পীডনেব
একই গণহননেব
সাজেনি কি ওবাই জহ্লাদ ?
আর তাই সেদিনেব বিচারক আজ
হাতে বক্ত মেখে বুঝি
এড়াতে পারে না মৃত্যু ফাঁদ।
তাইতো শত্রুর মুঠো ভেঙে ভিয়েতনাম,

দিনেরাতে আজ
প্রতিইঞ্চি জমিতে স্বাধীন!
তাইতো কোথায় সেই ফরাসী, দিয়েম ?
কতোদূরে ডালেসেরা ?   ম্যাকনামারা ?   চতুর মার্কিন ?
কার স্বপ্ন কোথায় কায়েম ?
জাহাজ জাহাজ গোলা, গ্রেনেড, মর্টার,
দলে দলে নৌসেনার জেহাদী চিৎকার ;
তারই মুখোমুখী তুমি, (কোথায় উপমা!)
চতুর্দিকে মানুষে মানুষ
ধনুর্বাণ হাতে দৃপ্ত, স্থির।
আর তাই পীড়নের ঘাঁটিগুলি ভেঙে দিনে দিনে
তোমারই দুহাতে আসে গ্রেনেড, মর্টার,
মুক্তিসেনা অদম্য শিবির!
আর তাই দিনে দিনে অজেয়, এখন
মার খাওয়া লুঠেরা-নায়ক,
(কে কাকে বাঁচায়, পলাতক!)
সমুদ্রে ঠেকিয়ে পিঠ সায়গনের আত্ম-অবরোধ
ভয়ে অন্তরীণ!

মরীয়া মার্কিন,
যতো সে পীড়নে হিংস্র
ততো তাকে টানে চোরাবালি –
যতো ডোবে ততো তার আগালি-পাথালি।
চতুর্দিকে টানে কাঁটাতার,
চতুর্দিকে উঁচানো সঙিন,
শুধু হেলিকপ্টারের –
রকেটের – প্লেনের গর্জন,
গ্যালন গ্যালন মদ,
মদিরাক্ষি বারবনিতার
ফ্লোর শো'র উল্লোল হুল্লোড়।

তবু ঠিক ঘাড়ের পিছনে
কে যেন দাঁড়িয়ে—শান্তি নেই ;
তবু কেন কথার ভিতরে
বারেবারে ছিঁড়ে যায় খেই ?
কেন প্রতি ভিয়েতনামী—ছেলেবুড়োনারী—
মনেহয় গুপ্ত আততায়ী ?
কেন কাছাকাছি এলে যেকোনো অতিথি ,
যেকোনো হোটেল বয়, যেকোনো পথিক,
মনেহয়, টেবিলের নিচে
মৃত্যুর ঘড়ির কাঁটা বোমার ভিতরে
নড়ে টিকটিক ।
আর তাই উত্তেজিত স্নায়ুর আঁধারে
ফেটে পড়ে কোণঠাসা পশুর চিৎকার—
যতো কাঁপে হৃদয়ের হিম পরিণামে
ততো তার খুনীর বিকার।

তবুও হাজার মৃত্যু পার হ'য়ে
দরজার মানুষ,
তবুও পায়ের নিচে
সারাক্ষণ চাপা সর্বনাশ ,
সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজে
সময়ের বুকের ভিতরে ,
শত নবকরোটির অভিশাপে
রক্তের অক্ষরে
কী প্রতিজ্ঞা লেখে ইতিহাস !

·৪

ইতিহাস ক্ষমাহীন,
পাশ ফেরে মানুষেরই দিকে।
কে থাকে, কে যায়, তার শেষের বিচার
জীবনেরই গতির নিরিখে।
কেননা সময় খোঁজে মানুষেরই মিলিত সাগর
কেননা মৌসুমী হাওয়া মোড় নিলে ঐ
ন'মে ক্ষ্যাপা ঢল ;
সে স্রোতে কে দাঁড়াবে পাহাড় ?
খানখান খসে তার পাষাণ শিকল ,
কেননা নদী যে যাবে সমুদ্রের দিকে
এই তো আজন্ম অধিকার !

ইতিহাস মোড় নেয়,
বোঝে·কি তা কালের জহ্লাদ ?
জানে কি সে,পীড়নের শেষের চূড়ায়
দাঁড়ালে জীবন তার যুগসন্ধি জেনে
হঠাৎ দুপায়ে আনে পাতালের খাদ ?
কেননা কে বাঁচে, আর কে মোছে সময়
জানে তারও নিপুণ হিসাব।
কতো প্রথা প্রতিষ্ঠান পুরনো ম্যামথ –
যুগান্তের কালঝাড়ে ভুলে গিয়ে পথ
রাখে শুধু ফসিলের ছাপ।··
মরীয়া মার্কিন আজ দিনবদলের
মঞ্চে খোঁজে পুরনো নাটক ;
ভাবে, তারই পায়ে বুঝি সাজানো কুর্নিশ ,
সময়ের বিস্ফোরণে চোখের উপর
ক্রমাগত ভাঙে তার ছক !

মানুষ দুনিয়াজোড়া ধমনীশিরায়
টের পায় জোয়ারের মতো
শতাব্দীসমুদ্রে আজ লেগেছে কোটাল ;
যেখানে যে আছে যতো মোহান্ত সর্দার,
শিকড়ে শিকড়ে লাগে চাড় ;
স্রোতের করালটানে ভেসে যাবে পুরনো জঞ্জাল ।
মানুষ দুনিয়াজোড়া চেয়ে দেখে ঐ
অযুত যোজন দূরে পেন্টাগনে নীলাভ আলোয়
কয়েকটি ভুতুড়ে ছায়া মানচিত্রে আঁটে
সাজানো লালে ও নীলে খুদে খুদে রকেটের পিন,
অথচ হাতের ফাঁকে একমুঠো বালির মতোই
কেবলি যে ঝ'রে যায় দিন !

কোথায় ভিয়েতনাম, বুকেপিঠে ভুখা সে কৃষাণ ?
কোথায় রবারবনে কফিক্ষেতে দাদনের কুলি ?
আফিঙে ও চরসের নিরক্ষর ঋণের কাদায়
যে ছিল পায়ের নিচে, কোন মন্ত্রে তোলে অঙ্গুলি ?
মানুষ দুনিয়াজোড়া দেখে তার স্বপ্ন-অভিযান—
অশ্রুরক্ত-অন্ধকারে তিলে তিলে জাগে সে কঠিন !
জীবনের সাড়া তু'ল আসমুদ্র চেতনাচূড়ায়
আলোর তরঙ্গে ঐ দাঁড়ালেন, তিনি হো চি মিন !

তিনি আলো দেখেছেন,
চোখে তিনি দূরের আকাশ ,
তিনি ভালোবেসেছেন,
পায়ে পায়ে মাটি তিনি, বুকের সাহস ;
দুহাতে শিকল ছিঁড়ে নারী ও পুরুষ
জাগে তাই নতুন মানুষ !
তিনি আলো দেখেছেন,
তিনি আলো জ্বেলেছেন,

পিতার হৃদয় তিনি, রক্তে তিনি জীবনের টান।
দাবার ঘুঁটির মতো বাজি রেখে তাই
খড়্গো খড়্গো দেন না তো শাণ।
তিনি যে প্রাণের তৃষ্ণা, নিয়ত নির্মাণ,
উচ্ছল কাজের দিনে তিনি চান শান্তির প্রহর,
বারেবারে চুক্তি তাই, অস্ত্র সংবরণ,
প্রতিবিন্দু রক্তপাত বাঁচিয়ে শিশুর
হাঁটিহাঁটি দিনে তিনি দিতে চান স্বপ্নময় ঘর।…
অথচ বুকের'পরে বারেবারে বুটের আওয়াজ,
বারেবারে ছেঁড়ে ওরা নতুন দলিল,
দিনেরাতে ঢালে শুধু বারুদ, ডলার,
বেপরোয়া বোমারুর আগুনের ত্রাসে
যোজন যোজন দূরে জাহাজ জাহাজ
দিনেরাতে নামে হানাদার।…
তাইতো কোমর বাঁধে ঘরে ঘরে অযুত মানুষ,
তাইতো মুক্তির নামে সারা দেশ তোলে হাতিয়ার,
প্রতিবিন্দু রক্তপাত বাঁচিয়ে, তবুও
যেহেতু হৃদপিণ্ডে আজ বিঁধে আছে মৃত্যুর অঙ্কুশ,
রক্তের সমুদ্রে নেমে তাই
দিনেরাতে খোঁজা শুধু তটরেখা তার।

তিনি আলো জ্বেলেছেন,
তিনি প্রাজ্ঞ, তিনি যে জীবন।
তাইতো সীমান্ত ওরা ডিঙিয়ে অবাধ
দিনান্তে দেড়শোবার উত্তরে এমন
নারীশিশু-ঘরবাড়ি-সেতু ভেঙে তবু
ভাঙতে পারেনি আজো মন।
তাইতো ইস্কুলে প্রতি পড়ুয়ার পাশে
ট্রেঞ্চকাটা ; তাই প্রতি ঘরের কোণায়
কংক্রীটের খুপরি এক চৌকোণা গুহার—

শিশুগুলি খেলা করে, সাইরেন বাজলেই
ঢোকে সে আশ্রয়ে, আর, সাইরেন বাজলেই
বেরিয়ে সে খেলা করে, ভয় নেই তার।
কেননা তিনি যে স্বপ্ন, দুহাতে সাহস :
তিনি বীর, আশাভরা বুক :
তাইতো মাঠের চাষী ধান কাটে, আর
পিঠে তার ঝোলানো বন্দুক।
কেননা জীবন যার নাড়ীস্পন্দে, তার
স্বপ্ন ও সংগ্রাম একাকার।
তাইতো মুক্তির সেনা দক্ষিণের যে গাঁয়ে স্বাধীন-
ভেঙেপড়া এরোপ্লেন সরিয়ে আবাদ,
পোড়া আগুনের দাগ মুছে তোলে ঘর,
গড়ে তারা ভাঙা-সেতু,গড়ে হাসপাতাল,
রাত্তিরে লণ্ঠন জেলে বসিয়ে ইস্কুল
ছিঁড়ে ফেলে আঁধারের জাল।
কেননা তিনি যে আলো, নতুন জীবন,
রক্তপঙ্কে নেমে তাই সারাদেশ আজ
মৃত্যুতে শিকড়, তবু সূর্য-অভিলাষী,
মেলে ধরে প্রাণের স্বরাজ ।

আর তাই পৃথিবীর দেশে দেশে ঐ
ঘরে ঘরে মানুষেরা, উজ্জীবিত-মন,
চেয়ে দেখে, সময়ের ক্ষমাহীন টান
পড়ন্ত অতীতে ভাঙে উড়ন্ত নিশান।
দর্পিত লোভের যতো শিকারী পিপাসা
অসহায় টাল খেয়ে পড়ে ঘুরে ঘুরে
ডানাছেঁড়া বাজের প্রতীকে। ..
আর তাই দিনেরাতে নতুনের আশা
ছুটে চলে কালের নিরিখে—
মৃত প্রথা-প্রতিষ্ঠান-স্তম্ভপতনের

যুগান্তের ধূলিঝড়ে ভিয়েতনামে ঐ
একটা পথ মানুষেরই দিকে।

৫

কথাটা এ'গিয়ে চলা,
বুকে হাঁটা পাহাড়ে খাড়াই।
কথাটা আগুনে নামা,
সাড়া তোলা মানুষের ঘরে।
কথাটা এগিয়ে চলা,
জ্বলে ওঠা সংঘর্ষচূড়ায়,
কথাটা জীবনে খোঁজা সময়ের উথালপাতাল
রক্তে কার পদচিহ্ন পড়ে।

কেননা উত্তরে যাও
অথবা দক্ষিণে,
ইতিহাসে অথবা হৃদয়ে,
পূবে বা পশ্চিমে যাও
শত জাতি-অধ্যুষিত ভূগোলের পলিতে, বা মনে,
একটা পথ হাঁড়িকাঠে মাথা
জাগে দিনেরাতে,
তাই তো শতাব্দী থেকে শতাব্দীর অন্ধকারে ঐ
হারানো শহীদ যতো উঠে আসে আজ,
হাত রাখে হাতে।

কে ঐ কোমরে-বাঁধা সাজানো বুলেট
প্রথম গুলির শব্দে উদ্ধত ভারত?
তুমি কি মঙ্গল পাঁড়ে? ব্যারাকপুরের
তোপের ছিটকানো মুখে প্রাণ দিয়ে তবু
খুলে দিলে পথ?

কে ঐ তীরের ফলা, আঁধারে নিকষ
সাঁওতালী পাহাড় ? তুমি
বিরশা-সিধু, শালপাতার প্রতীকে আগুন ?
তুমি কাহ্নু টাঙি-হাতে লালমাটি রাঙা
ঢেলে দিলে খুন !
তুমি কি বাংলার ঘরে জেগে ওঠা বীর
কামানের আগুনের বেড়াজালে ঐ
বাঁশের কেল্লার তিতুমীর ?
কে তুমি পাষাণ কারা ভেঙে খান খান
এমন কঠিন স্বপ্নে কোমল কিশোর
'একবার বিদায় দে মা' গেয়ে গেলে গান ?
ঐতো এলেন উঠে ক্ষুদিরাম, কানাইলালের
পদশব্দে কাঁপে দিকসীমা।
ঐ তো এলেন ঐ চট্টলের অস্ত্রাগার ভেঙে
প্রীতিলতা, জালালাবাদের
রাইফেলের পাশে টেগরা, সূর্য সেন, সূর্যের মহিমা
ঐ তো ভগৎ সিং। সারা দেশে উন্নত মহান
আসমুদ্র ঘরে ঘরে যারা দিনে দিনে
ফাঁসির দড়িতে দিল প্রাণ।
ওরা এল বোম্বাইয়ের বুলেটের মুখে তেজীয়ান
দলে দলে বিদ্রোহী নাবিক ;
ওরা এল স্বাধীনের ভারতী দিনের
পরাধীন ভূমিদাস, কলের মজুর ,
ওরা এল স্ত্রীপুরুষ শহুরে মানুষ ;
কেউ তারা কলকাতার পথের মিছিল,
কেউ তারা তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপের চাষী
প্রতিটি হৃদপিণ্ডে-বাঁধা সিসের গুলির
পোড়া বারুদের দাগ বুকে নিয়ে তবু
মুখে জাগে হাসি।

অযুত শহীদ আসে,
পায়ে পায়ে লাখো লাখো বীর,
সব দেশ মহাদেশ সময়ের শতাব্দী ডিঙিয়ে
পদশব্দ ক্রমেই অস্থির!
যতো স্বপ্ন উচ্চারিত, যতো সাধ মিশেছে হাওয়ায়,
যতো প্রশ্ন অনুত্তর, যতো রক্ত ঝরেছে মাটিতে,
এ কালসন্ধির লগ্নে সব ঋণ তারা শোধ নিতে
তোমারই অগ্নির পাশে, ভিয়েতনাম, অলক্ষ্যে দাঁড়ায়।

ঐ তো বাস্তিল থেকে পিতামহ দিন
হাজার নিশান হাতে উঠে আসে, তাব
গলায় উদ্যত গিলোটিন,
মুখে তবু উচ্চারিত মানুষেরই জন্ম-অধিকার!
ঐ শাদা বরফের নির্বাসিত ঘরে
সাইবেরিয়ার পথে কতো না শহীদ,
তিল তিল আত্মদানে দধিচির বরে
গড়েছে অক্লান্ত যারা জীবনের ভিত;
ঐ সারা রাশিয়ার, ওডেসার, ডনের, ভল্গার
হাজার শহরে গ্রামে, পেত্রোগ্রাদে, দূর এশিয়ার
তাজিক, কাজাক, শত শ্রমিক কৃষাণ—
মৃত্যুর সমুদ্র ছেঁচে পৃথিবীকে যারা
শুনিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী গান।
ঐ আসে মার্কিনের দূর উপকূলে
সাকো ও ভেনসিত্তি দুই কালের মশাল,
দুর্জয় সাহসে যারা রক্ত ঢেলে তবু
ছিঁড়ে গেছে ছলনার জাল।
ঐ তো রোজেনবার্গ-দম্পতি কেমন—
বিদ্যুতের চেয়ারের পীড়নের ফাঁদে
আমৃত্যু নীরব প্রতিবাদে
একবিন্দু টলেনি যে-মন।

ঐ কালো মার্কিনের ঘেটোর শিকার,
ঐ শাদা মার্কিনের নামহীন নারী ও পুরুষ,
হটাতে লড়াই-ক্ষ্যাপা লোভান্ধ বিকার
বুকে যার বিঁধে গেছে ক্রুশ।
ঐ তো কাস্ত্রোর সাথী গুয়েভারা বীর,
মানুষের যন্ত্রণার পীড়নে অস্থির,
কোন দূর বলিভিয়া, খামারের দূর পরবাসে
প্রাণ নিয়ে, উঠে আসে ঐ
মানুষেরই পাশে।
ঐ তো লুমুম্বা ঘন অরণ্যে নির্ভীক
সিংহহৃদি আফ্রিকার প্রাণ ;
স্বস্তিকার স্বস্তিহীন দাপটের মূলে দিয়ে টান
ফাঁসির মঞ্চের থেকে ঐতো ফুচিক।—
ঐ সারা পৃথিবীর কোটি কোটি অজানা তরুণ—
স্পেনের প্রান্তরে, গ্রীসে, মহাচীনে, কোরিয়ার মাঠে
এ জীবন জ্বেলে নিয়ে সমিধের কাঠে
তারাই তো ঘরে ঘরে অনির্বাণ প্রাণের আগুন।
অযুত শহীদ আসে,
পায়ে পায়ে লাখো লাখো বীর ;
সব দেশ মহাদেশ সময়ের শতাব্দী ডিঙিয়ে
পৃথিবীর গূঢ়তম নাটকের শেষ অঙ্কে আজ
ওরা করে ভিড়।
এবং সবার আগে ঐ
সায়গনের অবরোধে হেনে পদাঘাত
মহান শহীদ বীর
মৃত্যুর বুলেটে ছেঁড়া বুকের ধমনী,
দুর্জয় সাহসে তবু স্থির,
'এদেশ আমার' জয়ধ্বনি—
চলেন ভ্যান ত্রোই!

এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ—কে থাকে, কে যায়।
কবে যেন কার হাত দূর ইতিহাসে
কেবলি গলার দিকে আসে,
কবে যেন কার হাত কেবলি বাঁচার পথ খোঁজে
তার কালগ্রাসে।
এ দুই হাতের পাঞ্জা শতকে শতকে উঠে প'ড়ে
ভিয়েতনামে শেষের বিচার—
এ কালসন্ধির লগ্নে কে থাকে, কে যায়,
জেগে ওঠে তারই অন্তঃসার।
মানুষ দুনিয়াজোড়া ধমনীশিরায়
টের পায় জোয়ারের মতো
শতাব্দীসমুদ্রে আজ লেগেছে কোটাল ;
মৃত প্রথা-প্রতিষ্ঠান স্তম্ভ পতনের
স্রোতের করালটানে ভেসে যায় ঐ
পুরনো জঞ্জাল।
মানুষ দুনিয়াজোড়া চেয়ে দেখে আজ
মরীয়া মার্কিন যতো পীড়নে ভীষণ
ততো তাকে টানে চোরাবালি ,
যতো ডোবে ততো তার আথালিপাথালি !

এ এক মহান যুদ্ধ— দৃঢ়তম নিয়মে স্বাধীন ;
ঘন অশ্রু-অন্ধকারে অগ্নিশিখা হাজার মানুষ
পৃথিবীর বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে বেঁধানো অঙ্কুশ,
নিশানের মতো জ্বালে দিন।
এ এক মহান যুদ্ধ—
যেখানে যা কিছু বাঁচে, নড়ে,
পায়ে পায়ে তারি ভবিষ্যত ;
যতো স্বপ্ন উচ্চারিত, যতো রক্ত ঝরেছে মাটিতে,
পৃথিবীর দেশে দেশে হারানো শহীদ
দিনেরাতে গড়েছে যে পথ-

এ এক মহান যুদ্ধ, তারি ডাক রক্তের ভিতরে
প্রতিধ্বনি — নিহিত শপথ !
আর তাই কোটি কোটি জেগে ওঠা ঘরে
শত পূর্বপুরুষের স্মৃতির বাঁধনে
পরিচিত মাঠজল-গাছগাছালির
শতাব্দীর পলিতে, বা মনে,
যেখানে যা কিছু বাঁচে, নড়ে,
তিলে তিলে তারই ভবিষ্যত —
অশ্রুর লবণে ক্রোধে টাল খায়, বাঁকে,
হাতে নেয় কালের লাগাম ;
আর তাই রাত্রিফাটা উষার শিখরে
অন্ধকারে দপ্‌ করে সূর্যের সোনায়
এ কালসন্ধির লগ্নে জ্বলে ওঠে ঐ
ভিয়েতনাম — লাল ভিয়েতনাম ।

স্বাধীন কিশোর ও মানুষ

১

মাঝে মাঝে মনে হয়,
যদি পাই সে আমার হারানো জগতে,
আবার কিশোর, যদি পাই
গ্রামের আকাশ, আলো, সবুজ সতেজ
গাছগুলি, যদি পাই,
জীবন্ত হৃদয়ে আর নতুন দুচোখে
চেয়ে দেখি গাছগুলি, কখন যে কার
ফুল ফোটে ফল পাকে, মাটিতে আবার
বীজ থেকে কেমন অঙ্কুর।

মাঝে মাঝে মনে হয়
যদি পাই সেদিন আমার,
প্রথমে তো দুটি পাতা, আর দিনে দিনে
তৃষ্ণার জিহ্বার মতো জেগে ওঠে ঐ
নতুন সে-দিন, আহা, শিশুতরু, যদি
কিশোরের চোখে সেই জন্মের পাড়ায়
পাতার আদলে চিনি কার কী-যে নাম,
সব গাছ লতা-ফুল রঙে আর ঘ্রাণে
যদি পাই সেদিন আবার।
যদি চিনি পাখির শরীর,
তাদের ডানা ও রঙ শিস্‌গুলি চিনি,
যেমন আপন চেনা মানুষের গলা,
ঐ যারা গ্রামে থাকে, যারা
আড়াল বা দূর থেকে ডাকে,
সব স্বর শুনে সেই জেগে ওঠা মুখগুলি, আর
সব মুখ দেখে সেই পরিচিত স্বভাব তাদের,
কে কেমন চলে-বসে, রেগে ওঠে, হাসে,
কার ঘরে কী পূজোয় বেজে ওঠে ঢাক,

কার ঘরে বার-ব্রতে সাতপুরুষের
কামনার প্রতীকের আলপনায় বোনা
উঠোনের পায়ে পায়ে টের পাই যেন
আমারই রক্তের স্রোতে ঘুরে ঘুরে ঐ
আমারই জীবন।

মাঝে মাঝে মনে হয়,
কেমন সেদিন ক্রমে পুঁথির পাতায়
কাহিনীর টানে আর দূর অভিযানে
ছড়াই বাহিরে আমি,
ভূগোলের দেশে দেশে, সাগরে ও মেরুতে পাহাড়ে,
ইতিহাসে শিলালেখে প্রত্নের সাড়ায়
মানুষ, মানুষ, আমি সীমানা ডিঙাই,
গ্রামে থেকে তবু যেন গ্রামে নেই, আমি
মাথা তুলি নতুন মানুষ!

মাঝে মাঝে মনে হয়
যদি পাই সেদিন আবার,
জীবনের অভিযানে জেগে ওঠে নতুন জগত
আমারই এ মনে, আর মন থেকে মনে,
কিশোরী খেলার সাথী, দুটি চোখে তার
আরো এক হৃদয়ের নতুন পথিক
জোয়ারের জলে যেন খাড়িতে শিরায়
ক্রমাগত ঢেউ ভাঙে
আমি···আমি···আমি

মাঝে মাঝে মনে হয়,
সে আমার দূরে-চলা দিন
আমারই ভিতরে যেন তটরেখা ঐ
দিনেরাতে ডাকে শুধু, ডাকে···

ফিরে পাই সেদিন আমার
স্নায়ুতে হৃদয়ে মনে শতচক্ষু সেই
রূপে স্পর্শে চেতনায় ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন দিনেরাতে বেজে-ওঠা, আমি
যদি পাই, যদি –
ও আমার হারানো কিশোর !

২

অকস্মাৎ প্রশ্ন ফাটে – তাহলে, তাহলে
জানব কি যন্ত্রণা এই, তোলপাড় জীবন ?
হুড়মুড় হোঁচটে এই ছিটকে পড়া ইমারতে রোজ
স্বপ্নের কাঠামো ভেঙে ছত্রখান সাজানো সংসার ?
এই যে বেদনা, এই আর্তি, এই বাঁকা তলোয়ার,
জানব কি ছটফট এই অস্থিরতা ? তুফানের গাঙে
ডুবন্ত ডিঙির বুকে পেশীতে পেশীতে এ লড়াই
কোথায় মানুষ, মাটি, সাড়া খোঁজা, পাতালের টানে
হিম ঠাণ্ডা পরিণামে ক্রমাগত এড়িয়ে যাবার,
থাকবে কি যন্ত্রণা এই ছিলাটানা আতঙ্কের বুকে ?
জানবে কি কিশোর এই জীবনের স্নায়ুছেঁড়া মানে ?
উদ্যত বাঘের মুখে নগ্ন এই নিরস্ত্র চিৎকার ?
অর্থাৎ আমি যে ক্রমে ঠাণ্ডা ভয়ে কেবলি জমাট,
থাকবে কি রক্তের স্রোতে ব্যাকুলতা, সে আর্ত তোলপাড় ?

ভেবো না, জানি না আমি প্রতিপ্রশ্ন :   কেন খুঁজি জ্বালা ?
কেন সাধি দিনেরাতে শূন্য হাহাকার,
কাঁটার ওপরে এই পা ফেলে জীবন,
এই যে নিজেরই মনে খুঁজি বিস্ফোরণ,

ক্রমাগত ভেঙে চলি সাজানো সংসার,
কেন খুঁজি জ্বালা, কেন নরকের দাহে
স্বর্গের শান্তিতে আনি যন্ত্রণার শিখা—
ভেবো না, জানি না প্রশ্ন দুচোখে তোমার ?
আমি-যে দেখেছি তুমি
তোমরা বা সবাই
কেবলি থিতিয়ে পড়ো,
ডুবে যাও, নিয়ত হারাও
আমি-যে দেখেছি তুমি
তোমরা বা সবাই…
আর আমিও কি নই ?
আমিও তো জমে যাই,
কেবলি পাথর,
সেই ভয়, ব্যাকুলতা
বুকে আইঢাই
বারে বারে ছেড়ে যাই ঘর,
উচ্ছল স্রোতের বেগে
খুঁজে ফিরি কেবলি বহতা !…
আমি যে দেখেছি তুমি
তোমরা বা সবাই
ক্রমাগত নিভন্ত আবেগে
চারিদিকে গড়ে তোলো গড়,
স্বপ্নে আর জাগরণে
দিনেরাতে বাজাও ঝুমঝুমি,
দিনেরাতে ওঠে শুধু হাই,
বেঁচে আছো স্থিতিময়
জীবিত মরণে।
অথচ জানো না, তুমি নাই—
তুমি আজ তোমারই কবর।

ভেবো না, যাইনি আমি কবির পাড়ায়।
কাঠের রঙিন চৌকো শিশুরা যেমন
নানা ছাঁদে নানা ছকে খেয়ালে সাজায়,
অথচ মূলত তার পরিণামে পুনরাবর্তন,
শব্দের খেলায় সেই ক্রমাগত থোড়-বড়ি-খাড়া
সুন্দরের মুখে আঁটে আরোপিত চিত্রিত মুখোশ,
হাসে না কাঁদে না সে-যে, স্থিতিমূলে লাগে না-যে সাড়া,

গিয়েছি ছবিব ঘরে, রঙের আদল
দেখেছি তুলির টানে : মুগ্ধ স্বরলিপি
শুনেছি গানের স্রোতে সতত উচ্ছল ;
ছুঁয়েছি পাথরে গড়া মূর্তির পৃথিবী,
জেনেছি প্রয়োগে-জ্ঞানে গবেশণাগার ;
বুঝেছি নেতার বুকে স্বদেশ কেমন ;
তবুও যে-যার বৃত্তে কয়েদী, যে-যার
হাতিব উপমা খোজে অন্ধের মতন।

হে বিজ্ঞানী, তুমি জানো স্থিরচিত্র, সে কেন চঞ্চল –
মূহূর্তে সে বাঁধা থেকে ভেঙে যায় কালের সীমানা ?
হে শিল্পী, তুমি কি জানো জননেতা কী স্বপ্নে সফল ?
বকযন্ত্রে কী রহস্য, ওগো কবি, আছে কি তা জানা ?

যে-যার আপন বৃত্তে, যেন এক ঘন অন্ধকারে
কয়েকটি মানুষ ব'সে ; গায়ে লাগে এ-ওর নিশ্বাস ,
অথচ দেখেনি মুখ – কোন সাধ অন্য বুকে বাড়ে,
পাথরে হৃদয় মুড়ে অভ্যাসের মূঢ় ক্রীতদাস।

যাব না যাব না আমি
ও গাঢ় গুহায়,

খণ্ড খণ্ড জীবনের প্রতিধ্বনি বুকে
উদাসীন শূন্যতায় বাঁধা
হব না নিঃশেষ।
আমি-যে দেখেছি প্রাণ শহরে ও গ্রামে
স্বেদবিন্দু-ঘেরা মুখে আলো-উদ্ভাসিত
সচল নদীর
তরঙ্গের মতো দোলে,
ওঠে, পড়ে, ঘূর্ণিতে জড়ায়
আবার ছিটকায় ঐ সতত অস্থির।
থিতোনো-বিহীন তীব্র স্রোতের ধারায়।
আমি-যে দেখেছি তার দিন
ঐ যারা কলে আর মাঠে
লিখে যায় ইতিহাস, কাছে-দূরে হাজার বন্ধন
শ্রমে আর প্রেমে আর ক্রোধের সাড়ায়
এ-ওর হৃদয়ে পথ কাটে,
জেনেছি সে বেঁচে-থাকা, জেগে-ওঠা, সচল জীবন।
প্রতিটি মানুষ যেন বয়সের অঙ্ক মুছে ঐ
শাণিত কিশোর,
আমি-যে চিনেছি সেই মন।

৩

তাহলে এই-যারা পাশে
অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক পাথর –
তারা দূরে যাক।
তাহলে এ উদাসীন শিল্পের জগত,
পরিচিত জ্ঞানী আর কর্মীর এ পথ,
বাহিরে দাঁড়াক।
খণ্ড খণ্ড কামনার পুনরাবর্তনে
আমরা সবাই মৃতবৎ –
জীবন্ত ফসিল,
হে কিশোর সতেজ, স্বাধীন

পুরনো দুর্গের বন্দী মরচে-ধরা মনে
খুলে দাও খিল।
দাঁড়াব তোমারই পাশে, হে আমার হারানো জীবন,
ঐ সাধ, সচলতা, সাহসের চোখে-চোখ দিন
জড়াব হৃদয়ে, আমি ঢেলে দেব আমারো এ স্মৃতি ;
বছরের সিঁড়ি বেয়ে জেনেছি যে ঝড়ের আকাশ—
পথের ধুলোয় লুটে তুলে ধরে প্রাণের নিশান ;
দেখেছি জীবন আমি আড়াআড়ি এ-কোণ ও-কোণ
সম্মুখে পিছনে শত বাঁধনে ও মুক্তিতে জটিল
তীব্র টানাপোড়েনের দিনেরাতে দ্রুত বর্তমান,
সেই তো আমার দিন, বেঁচে থাকা, তারই টানে আমি
খুঁজেছি বুকের এই বীজক্ষেতে হারানো শিকড় ;
হে কিশোর, চেতনাব কেন্দ্রে আনো সময়ের টান।

মাঝে মাঝে মনে হয়,
যদি জাগি, আবার দাঁড়াই
শিরদাঁড়া-খাড়া আমি নতুন মানুষ···
যদি-না শুকোই, ঝরি,
যদি বেড়ে উঠি, আর নিজেকে ছড়াই
এ দুটি চোখের মাঝে যদি পাই তৃতীয় নয়ন !
মাঝে মাঝে মনে হয়
এ আমার জঙ-ধরা স্মৃতিতে আবার
যদি জাগে দুরন্ত জীবন—
তেজী ঘোড়া, বাঁকানো গ্রীবায়
খুর ঠোকে বুকের পাথরে ··
মাঝে মাঝে মনে হয়
আজীবন গায়ের উপর
এই-যে খোলস, এই আরোপিত ত্বক,
দিনে-দিনে আচরণে প্রথা আর পুরনো খাঁচায়

এই-যে আকাশ ভুলে নিভন্ত হৃদয়,
রাশি রাশি মৃত যতো বাঁচার সময়
মাছের শবের মতো হিমঘরে রাখি নিরালোক,
অথবা লোভের জালে বন্দী যেন বনের হরিণ,
এই-যে আমি বা তুমি, আমরা তো সবাই,
বাঁচার সাহস ভুলে আছি অন্তরীণ।…
মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি জাগি, যদি
হে কিশোর, তোমারই স্বাধীন
ছকের বাহিরে দেখা দাঁড়ানোর মাটি খুঁজে পাই!
তাহলে জীবন আমি,
তাহলে নতুন—
আমারই ছেলেটা যেন, তারই জগতের
তুলামূল্যে ফিরে পাই নিহিত সাহস,
পরিচিত পৃথিবীর সব অন্তঃসার,
সব তৃষ্ণা, সব চিন্তা, সব রূপ রস,
মেপে নিতে পারি সে ওজনে—
তাহলে আবার আমি
এক-এক মিনিটে বাঁচি, এক-এক বছর
নিবিড় খাড়াই আয়োজনে।

যদি সে হৃদয় পাই
যদি পাই সে তৃষ্ণা আমার—
হে কিশোর, স্বাধীন কিশোর,
জীবনের সংঘর্ষে ও মনে
আমি যেন আমি নই আর!

মানুষ…মানুষ

১

বাংলার মাটির পাশে
চিরকাল সমুদ্রের ঢেউ।
চিরকাল ঢেউগুলি
যেন কার আদরের নরম আঙুল
বালিতে ছড়ায়,
লোনাজলে খাঁড়ির ভিতর
ধমনীর জোয়ারের আবেগের বানে
চিরকাল ঢেউগুলি ভাসায় দু'কূল!
সমুদ্রকে ভুলে যাই তবু,
ভুলে যাই সমুদ্রের স্বর।

কোথায় হারালে তুমি সপ্তডিঙা চাঁদ সদাগর?
বাণিজ্যবায়ুর পালে কড়ি আর শঙ্খ আর লবঙ্গ সোনার
কোথায় খুঁজেছ তুমি রাশিচক্রে হারানো বন্দর?
কোন মশানের খড়্গো শ্রীমন্তের কমলে কামিনী
খুলে দিল মানুষেরই অজানা সংসার?
সে দূর স্মৃতির স্বপ্নে শূন্য নিরাকার
আমরা রয়েছি চিরঋণী—
ভুলেছি সে রৌদ্রের প্রহর।

আমরা রয়েছি শুধু বেঁচে,
অন্তহীন চিরনির্বাসনে
বৎসর বৎসর।
ভুলেছি সে হার্মাদের লুঠেরা জাহাজ;

কামানের বিস্ফোরণে, কামনার বলাৎকারে, খুনে·
নীলের চাবুকে আর বিদ্রোহের স্খলিত আগুনে
নিভে-যাওয়া প্রাণের স্বরাজ।
আমরা ভুলেছি সেই বেদনার সংঘর্ষের
শাণিত মৃত্যুর মূল্যে লেখা শিলালিপি—
ঢেউয়ের চূড়ায় যার দিগন্তের সাড়া যায় মুছে
আরো এক ঢেউ তার রক্তের ভিতর
পায়ের তলার মাটি ভাঙে দিনে-রাতে,
ঘুচে যায় সাজানো নির্ভর।

আমরা বেঁধেছি শুধু ঘর।
সমুদ্রকে ভুলে তবু আমরা সবাই
হামাগুড়ি উঠোনের পথ ঘুরে আজো:
বাসরে আপিসে আর প্রসূতিসদনে
জন্মের আদিম বৃত্তে ঘুরে ঘুরে নিয়ত সদাই
বেঁচে আছি বৎসর বৎসর।
চিতার জ্বালানি হয়ে চিন্তার চিতায়
বেঁচে আছি আদগ্ধ মরণে।

২

অথচ অসাড় নই, নই যাযাবর ;
ক্রমাগত দিনেরাতে খুঁজে তৃণভূমি
মেষের গলায় ঘণ্টি শুনে সে জীবন
জানি দস্যু জিঘাংসার আকালে মড়কে·
ঝরে যায় পথেরই ধুলোয়।—
সময়ের দায়িত্বের মুখে তুড়ি দিয়ে
আমি নই সে রম্য বর্বর।

কেন-না আমিও জানি ঘর।
আমি জানি স্বপ্ন তার, রচনা ও মন ;
সে এক মন্ত্রের মতো দিতে পারে উৎসারিত আশা —
অণু থেকে মহাকাশ ধরে-থাকা মনীষা ও প্রেমে ,
গত আর অনাগত হতে পারে দরোজায় স্থির
চিত্রার্পিত প্রতীক্ষার বধূর প্রতীক ,
আমি জানি সে তৃষ্ণা নিবিড়।
কেন-না আমিও তার শিশুর ভাষায়
কচি-কচি মুঠোভরা আদরের গানে
দিনান্তেব আগুনের পরিখা ডিঙিয়ে
জানি, পাওয়া যেতে পারে জীবনের আরো এক মানে।
কেন-না আমিও জানি, থাবা-তোলা জীবিকাব পথে
যতো লোভ, যতো দাহ, ঘৃণা ও ঘামের
নিয়ত সংঘর্ষে যতো বিকারের জ্বালা,
ঘবের মাটিতে তারই মৌন হতাশ্বাসে
ভেঙে যেতে পারে এই চেতনার মহলে মহলে
জঙধরা নিষেধের তালা।

তবুও সময় আজো চতুর জিহ্বায়
ফুলের বঙের মতো চেটেছে নাকি সব সজীবতা ?
উজ্জ্বল জিজ্ঞাসাগুলি ঝরে নাকি মনের মাটিতে ?
স্মৃতির ভিতরে আজো নিপুণ সময়
অন্ধ বাদুড়ের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ গাঢ় অন্ধকারে
উড়ন্ত বাসনাগুলি অধোমুখে ঝুলিয়ে শাখায়
খোঁজে নাকি স্থিতিস্থাপকতা ?......
স্বপ্নগুলি, আশা সেই, নিহিত গর্জন,
যেন দূর হিমালয়ে জমে-যাওয়া তুষারের নদী —
একদা-চলন্ত শত মৃত তরঙ্গেরা
প্রস্তরিত বরফের স্থির ওঠাপড়া ;

অথবা এ যেন এই বুকেরই দেয়ালে
তেজীয়ান যৌবনের মুখের আদল
পৃথুল সময় তার স্থূল হস্তলেপে
দিনে-দিনে রঙ-জ্বলা হলুদ, সুদূর
পূর্বপুরুষের ম্লান ছবির মতোই
করে নির্বাপিত।

আর তাই ঘরের ভিতরে
যেন একই নাটকের প্রথম দৃশ্যের
ঘুরে ঘুরে অভিনয়, পরিণতিহীন ,
আর তাই স্নায়ুর পীড়নে
প্রশ্নের পাতালে ডুবে ক্রোধে, আর
ক্রোধের পাতালে ডুবে
অবসাদ — শূন্য অবসাদ ;
আর তাই স্তিমিত আলোকে
নিজেরই হৃদয়ে দিনেরাতে
ক্রমাগত যেন এক মৃতদেহ বয়ে
মিটে যায় জীবনের সাধ।

৩

বরং বাহিরে চল।
মাঝে মাঝে যাওনি বাহিরে ?
সেই ট্রেনে-চড়া, সেই ছোটনাগপুরের
টিলা আর ঝরনা আর উদ্বেলিত মাঠের খোয়াই,
রাঙামাটি, মাদলের তালে কালো মেয়ে,
নেচে নেচে রাত ভোর, মহুয়া পলাশ,
জানোনি কি চোখে আর কানে আর ঘ্রাণে ?

ছাখোনি কি দিনে-দিনে নতুন মানুষ
তোমারই হৃদয়ে তুমি — কুয়াশা এড়িয়ে
তামার টাটের মতো হেমন্তের আরক্ত সূর্যের
আবির্ভাব ? পড়ে নাকি মনে ? —
মনে কি পড়ে না ?
তখন এ ঘর, এই
পুরনো চিঠির মতো মুছে-যাওয়া লিপি
মেঘেঢাকা বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারে
দপ্‌ করে জ্বলে নাকি বিদ্যুতের সোনার লিখনে ?

তখন দূরের থেকে
কামনার নব জাগরণে
সব তুচ্ছ স্মৃতি যেন ভোরের আগের
নিঃশব্দ নীলের কানে টোড়ীর আলাপ —
বিষাদের আকাঙ্ক্ষার মগ্ন দ্বিচারণে
মেলে ধরে ময়ূরকলাপ,
তখন দূরের থেকে
নোনা ধরা দেয়ালের স্যাঁতানো গলির
জানালায় বসে যেন শুনি মনে মনে
টাইগ্রিস্‌-সিন্ধুর তীরে
শিলালেখে, সাম্রাজ্যের বাণিজ্যতরীর
অস্ত্রের ঝঙ্কারে, শিল্পে, প্রেমে ও ঘৃণায়
মানুষেরই সংগ্রামের গভীর দ্যোতনা ;
তখন প্রতিটি মুখ অজানা রাত্রির
পথমোছা তেপান্তরে প্রদীপের মতো
স্থির অভ্যর্থনা ,
তখন তুমিই যেন হৃদয়ে তোমার
আরেক রচনা !

তাহলে বাহিরে চল।
শুধু নয় হাওয়া-বদলের
ঘরের বাহিরে ঐ উঠোনের মতো ;
মনে করে গেছ তুমি
দ্রাঘিমার সীমা ভেঙে দূর দেশে নতুন ব্রাজক ;
ভাষার অসহযোগে, প্রথার, স্মৃতির
সাঁকোভাঙা দিনে সেই পড়ে নাকি মনে
মাছের জগতে যেন ওতপ্রোত জলের মতোই
আজন্মের নিহিত স্বদেশ—
স্বপ্নে আর কাজে আর মানুষে মানুষ
সে বাতাবরণে ?······
তখন ঘরের থেকে বাহিরের আরো বহু ঘর
উত্তরে দক্ষিণে এই মন্দিরে ও গোপুরমে
মাঠে আর কলে আর পরগণা তশিলে—
তৃষ্ণা তার দাহ তার, নিবিড় কামনা,
মাটির তৃণের মতো মনের মাটিতে
বাঁধা কি ছাখো না পরস্পর ?

অথবা উৎক্ষিপ্ত শূন্যে
অগ্নিপুচ্ছ রকেটের নাবিক উধাও
যদি যাও মহাকাশে—যেমন মানুষ
বিস্মিত ছ'চোখে ঐ কক্ষের সুদূর
উপগ্রহে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর সোনালি নীলের
বিশাল মুক্তার মতো আবির্ভাবে স্তব্ধ নতশির-
যদি যাও মনে, কিম্বা স্বপ্ন-জাগরণে,
মাটির গোলকে, দূরে, শত শতাব্দীর
মনীষার কামনার আবেগে অস্থির
শত শত মানুষের জন্মপরম্পরা
শতশত হৃদয়ের খাঁড়ির ভিতর

গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ
হাওয়ার নিসনে, রৌদ্রে, ধ্বনি প্রতিধ্বনি
শোনো নাকি সমুদ্রের স্বর ?

৪

তাহলে সমুদ্র ঐ !
বাংলার মাটির
উপকূলে, জীবনে ও বুকের ভিতর
চিরকাল ঢেউগুলি নিবিড় গভীর
বারে বারে ভেঙে যায় ঘর—
শোনো সেই তরঙ্গের সংঘর্ষে অস্থির
সমুদ্রের স্বর ।

কেননা আমি-যে জানি
এক-একটি আঙিনা তার ইটের পাঁচিলে
মাটিকে ঘেরে না শুধু, বাঁধে সে সময় ;
এক-একটি-বাসনা তার মুকুলের ফলের শরীরে
নিটোলতা পার হলে জমে তিলে তিলে
অন্তঃসারে পচনের ক্ষয় ;
কেননা আমি-যে জানি
উজ্জ্বল সোনার বুকে মোহরের স্মৃতি এঁকে দিয়ে
সাম্রাজ্যের পতনের ভগ্নস্তূপে প্রত্ন গবেষণা
নষ্টলিপি শক্তি সেই স্খলিত করুণ ;
কেননা আমি-যে জানি
শতশত গুল্ম-কড়ি-ঝিনুকের সিঁড়ি বেয়ে
ডাইনোসর নর-বানরের
ধমনীর প্রজননে রক্তে আজো সে আদিজননী
সমুদ্রেরই উন্মথিত স্তন ।······

তাহলে সমুদ্র আজ !
ঘরের ভিতর
হৃদয়ের উপকূলে গোপন গভীর
শুনি ঐ ঢেউয়ের গর্জন —
কোটি কোটি মানুষের কামনার শিখরে শিখরে
রৌদ্র আর বৃষ্টি আর নদীর শিরায়
অগণিত সভ্যতার উত্থানে ও পতনে অস্থির
সচল জীবন্ত এক স্পন্দমান নিয়ত উৎসার
শতশত জাতি, আর সীমান্তের, ভাষার, মনের-
ঢেউয়ের উপরে ঢেউ খণ্ড খণ্ড একাকার ঐ
মানুষ···মানুষ···একি সমুদ্র মাভৈ
মানুষেরই সমুদ্রের স্বর —
ঢেউয়ের আঘাতে, স্বপ্নে, সংঘর্ষে স্বাধীন
বারে বারে ভাঙে, গড়ে,
ভেঙে ভেঙে গ'ড়ে চলে ঘর ।।

আমাকে বাঁচতে দাও আমাকে জাগতে দাও

১

আমার সাপে-কাটা নীল শরীরটাকে নিয়ে
তুমি, বেহুলা, এ কাকে ফিরিয়ে আনলে ?—
এই ইন্দ্রের মতো যৌবন,
এই বজ্রের মতো সাহস,
আর আমার স্বপ্ন, আমার উল্লাস,
এ আমি কোথায় রাখি।

গাঙুরের ক্লান্ত জলে, মনে পড়ে, সেই আমার যাত্রা,
আর শোকের মতো দিনগুলি, অশ্রুর মতো রাত্রি ;
আর আমার ত্বক আমার পেশীর মধ্যে কীটের দংশন,
কঙ্কালের বীভৎসতায় সেই আমার দ্বিতীয় মৃত্যু,
আর কলার মান্দাসের ওপর গ্রীষ্ম বর্ষা শীত,
আর তুমি, বেহুলা, তোমার প্রতীক্ষা ,
হতাশ্বাসের পাতাল থেকে দূরতর পাতালে তুমি,
তোমার কপালের সিঁদুরে সকালের সূর্য,
কেন, কীসের আশায় নারী
ঝাঁপিয়ে পড়েছ ঐ শূন্যতার খাদে—
মৃত্যুকে দুহাতে জড়িয়ে অমরতার দিকে।
আর স্বর্গের সেই নিস্পন্দ আরামের বুকে যন্ত্রণার চাবুক,
আর ফেনিয়ে ওঠা রক্ত,
আগুনের শিখার মতো সেই তোমার নৃত্য,
আর ফিরিয়ে আনা আমাকে এই পুরনো পৃথিবীতে,
কেন, প্রিয়তমা নারী, কেন ?—
কোথায় রাখি আমার এই জাগিয়ে তোলা জীবন ?
আমি যে আঙুলের ডগায় ছুঁয়ে এসেছি এক বিদ্যুৎ,
কার হাতের ওপর রাখব আমার হাত,
কার স্বপ্নে ধ্বনিত হবে আমার রক্তের আহ্বান,

বেহুলা, এ কাকে ফিরিয়ে আনলে তুমি,
কোথায়।

২

আমার চোখের সামনে ভাসছে
সেই আমার আগামী জন্মের সংসার।—
মৃত্যুর অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে
শতক থেকে শতকে
আমার এই সাপে-কাটা শরীর ফেলে
পা রেখেছি যে মাটিতে ঘাড়-বাঁকানো ঘোড়ার মতো উদ্দাম,
আর তুমি, নারী, আশ্বিনের ছায়াপথের মতো
আকাশের এ-কোণ থেকে ও-কোণ ছুঁয়ে
খুলে দিয়েছ যেখানে পৃথিবীজোড়া তোরণ,
আর আমার রক্তের মধ্যে সমুদ্রের তোলপাড়—
ঢেউয়ের ওপর লাফিয়ে ওঠা শত শত ঢেউয়ের হতে-থাকা,
আর নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তুঙ্গ মুহূর্তে
সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি—
সমস্ত ধারণার ওপর আমার দুই করতলের চাপ,
আমি অণুবিদারণের ক্ষমতা নিয়ে
উড়ন্ত শিমূল তুলোর মতো আমার যৌবনের কামনা
ছড়িয়ে দিচ্ছি নক্ষত্রের বাষ্পে মহাকাশ থেকে মহাকাশে .
আর পায়ের নিচে আমার পৃথিবী
সৃষ্টির নাভিমূলে পদ্মের মতো
খুলে দিয়েছে তার নিবিড় মমতার উৎসব ;
আমরা দুরন্ত এক জেগে-ওঠার বিস্ময়ে
জিহ্বার আঘাতে বাজিয়ে তুলেছি সেই অনন্তকালের হাওয়া,
আমরা সমস্ত ঘরবাড়ি আর প্রতিষ্ঠানকে
লোহার মতো গালিয়ে
দাঁড় করিয়ে দিয়েছি অন্য মাপের ভিতের ওপর,

আর সমস্ত স্তম্ভের গায়ে কান পেতে শুনেছি
নৃসিংহের গর্জন,
মাটিতে পা রেখেছি আমরা তাই শুধু পা তুলে নেবার জন্যে,
আর তাই গতির লাবণ্যে, বেহুলা, তোমার
চুল উড়ে পড়ছে আমার গায়ের ওপর,
আমার রক্তের মধ্যে জেগে উঠেছে তাই নদীর উৎসার।

৩

আর আজ
এ তুমি কোথায় আনলে বেহুলা?
সেই মানুষদের কথা তো আমরা জানি
যারা এক জন্মের নৌকোয় চলতে চলতে
হঠাৎ পিছিয়ে এসে নেমে পড়ে আগের জন্মের ঘাটে;
আর একজন্মের গোলাপে
অন্যজন্মের কাঁটা
জখম করে যাদের স্বপ্নগুলোকে।
তবু সময় তাদের সঙ্গী
চলতি জীবনের জোয়ার লাগা টান
ডেকে নেয় তাদের বাসি-জীবনের ডাঙা থেকে—
ঢেউয়ের আদরে গলুইয়ে জেগে ওঠে দিগন্তের সাধ
আর সেকালের সেই যাযাবর আর্যদের মতো
পুরনো বর্বরতার ওপর সুরলোকের সাজ পরাতে পরাতে
জানতেও পারে না কখন তারা ম'জে যায়
তাদের নতুন মাটির সোমলতার উৎসবে।

আর আমি, আমি এ কোথায়?
এ কেমন জাতিস্মর আমি?
আমি যেন জন্মে গেছি অন্য জীবনে,

আর মানুষের ঘর থেকে ছিনিয়ে আনা শিশুর মতো
দিনে দিনে নেকড়ের দলে নেকড়ে-মানুষ আমি—
এই ক্ষুধা আর মৃত্যুর জগতে
অরণ্যের গুল্ম থেকে গুল্মে শিকারের পিছনে
রক্ত হাড় আর চিৎকারের নগ্নতায়
আমার বুকের ভেতর গুমরে ওঠে মানুষের ভাষা—
আমার আগামী জন্মের-মায়ের পাশে শুয়ে
সসাগরা পৃথিবীর স্তনের ওপর হাত রেখে যা আমি শিখেছি·
অথচ যা আমি বোঝাতে পারি না কাউকেই ;
আমার শিরার মধ্যে সহস্র ঢেউয়ে জেগে উঠেছে
আকাশগঙ্গার মতো দৃপ্ত দীপ্ত বলীয়ান এক ভালোবাসা,
অথচ যার সঙ্গীত আমি শোনাতে পারি না
এমন কি তোমাকেও, বেহুলা,
এই বোবা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে !

৪

তুমি ভাবছ, বাড়িয়ে বলা ?
হায় নারী, আমার বুকের ওপর কখনো কান পাতো নি ?'
আমি যেন চলে গেছি স্বাতীনক্ষত্রের কোনো গ্রহে
আর ফিরে এসেছি আমার সেই ফেলে যাওয়া জীবনে
সময় চলেছে যেখানে গোরুর গাড়ির চাকায়,
আর আমি আমার গোটা বছরকে ধরেছি
ছুঁচের ডগায়,
কেমন করে বাঁচি এই শূন্যতায়
দুই তুলাদণ্ডের নাগরদোলার টানে ?

আমি তো চলতে শুরু করেছি সকাল না হতেই
নক্ষত্রের কাঁটায় ভরা রাত্রির ওপর দিয়ে
কুরুক্ষেত্রের মাঠ থেকে বেরিয়ে অশোকস্তম্ভের বিস্ময়ে,

সপ্তডিঙা ভাসিয়েছি শ্যামকম্বোজের দিকে,
আর কালিদাসের নিটোল আঙুরের মতো প্রেমে
আর কথাকলি নাচের শৌর্যে
মন্দিরে পাথর সাজিয়ে, মূর্তির কারুকাজে,
রঙের সংঘর্ষে আর চেতনার বিস্ফোরণে,
দিগন্তের পরিধির পর পরিধি খুলে
বিশাল এক ডানামেলা দেবদূত যেন –
আরূঢ় হয়েছি গোটা পৃথিবীর মুখোমুখি,
আর তখনি যেন সময়ের বজ্রাঘাতে
ছিটকে পড়লাম সেই যুগযুগান্তের পিছনে
নগ্ন অন্ধকারের কোনো গুহামানবের গহ্বরে।

আর দিনের পর দিন আমার সেই আকাশের ডাক,
তোমার হাত ধরে, বেহুলা, দেখে এসেছি যে স্বর্গ,
আমাদের এই মরা শতকের পরিখা ডিঙিয়ে অন্য শতকে,
শোঁয়াপোকার বুকের ভেতর থেকে যেমন বেরিয়ে আসে প্রজাপতি,
পিঁপড়ের চোখের মতো ছোটো বটগাছের বীজ থেকে
সেনাপতির শিবিরের মতো বিশাল এক বনস্পতি,
স্পন্দমান সমুদ্রের সেই জীবন্ত বিপুলতাকে বুকে নিয়ে
কী তুচ্ছ এই হাঁটুজলে অবগাহনের সাধ,
কী করে আমি বুকে হেঁটে ঢুকব ওই জন্তুর খোঁয়াড়ে ?
আমার দু'চোখে শুধু যে এখন আকাশ –
আমার আকাশ !

৫

আহ্, সেই আমার উল্লাস,
যন্ত্রণার মতো তীক্ষ্ণ সেই সুখ

আমি চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই
অযুত বছর আগেকার সেই আমি আর তুমি,
ঝড়ে-ভাঙা গাছের গুঁড়িকে গড়িয়ে
তার গতির তীব্রতা যোজনা করেছি যেদিন চাকায়,
আর ছুটন্ত হরিণের পিছনে সেই উল্কার মতো রথ।
পদানত প্রকৃতির অবাধ্য শক্তির কেন্দ্রে
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি যেদিন বীরের মহিমায়,
আর আমার কপাল যেন তুষারমৌলী হিমালয়ের মতো
ঝলমল করে উঠেছে

সকালবেলার সোনালি রোদে,
আর তুমি, নারী, রজস্বলা বসুন্ধরার বুকে জাগিয়ে তুলেছ
শিশুশস্যের প্রথম বিস্ময়,
ক্ষুধাকে বেঁধেছ তুমি হাতের মুঠোয়,
আর খোলা জ্যোৎস্নার মাঠের ওপর
ময়ূরের পালক দিয়ে শরীর ঢেকে
তোমার সেই আদিম লাবণ্যের নৃত্য···
শতশতাব্দী পার হয়ে
সেই একই সীমানা ছাড়ানোর লগ্ন কি বেজে ওঠে নি
ইন্দ্রসভার নূপুরে—
যখন আমার সাপে-কাটা শরীরের কঙ্কাল
জীবনের পরিচিত বৃত্তের বাইরে হঠাৎ খুঁজে পেল
এক অজানা প্রাসাদের চাবি,
আর তার মহলের পর মহলে দরজার পর দরজা,
আর রক্তের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্·······
যেন পুরনো যাদুঘরের মরচেধরা খাপ থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে এলো আমার শাণিত ইস্পাতের মতো এই চেতনা,
আর এখন, বেহুলা,
আমার হৃদয়কে আমি কার হাতে দেব!

৬

দিন যায়, রাত্রি যায়,
কোথায় রাখি আমার এই জাগিয়ে তোলা জীবন ?
আমি-যে আঙুলের ডগায় ছুঁয়ে এসেছি এক বিদ্যুৎ,
কার স্বপ্নে ধ্বনিত হবে আমার রক্তের উল্লাস,
কার চোখের পিছনে বসাব আমার এই চোখ,
কার জিহ্বায় বাজিয়ে তুলব জিহ্বা ?
কী করে গুঁড়িয়ে যাব আমি বৃষ্টির মতো
কোটি কোটি বালুকণার উদরে ?
বেহুলা, আর কতো দিন আমাদের এই জাহাজডুবির দ্বীপান্তর,
কতোদিন এই অশ্রুর গর্জন,
উপকূলের হাতছানি,
কবে আমরা ভেলা ভাসাব আমাদের সেই বেঁচে ওঠার দিকে ?
শতক থেকে শতকে,
তোমার চোখে চোখ রেখে
তোমার বুকে বুক,
আমি জন্মে গেছি যেখানে অন্য জীবনের আঙিনায়,
আমি দাঁড়াতে চাই সেখানে মাটির ওপর পা রেখে !
আমাকে যোজনা করো বেহুলা
আমার সেই সূর্যোদয়ের কুণ্ডে ;
আমার এই সাপে :াটা শরীরের কঙ্কাল থেকে
লাফিয়ে উঠুক আগুন
আর আগুনের মতো মানুষ··· ··

আমাকে বাঁচতে দাও ॥

আমাকে জাগতে দাও

আমারই বুকের হাড় থেকে তুমি,
আর আজ, নারী, তুমি কোথায়? .....
তাল তাল অন্ধকার আর অশ্রু, অশ্রু আর অন্ধকার,
আর আমার স্বপ্ন, আমার নির্মাণ ; তবু
তোমাকে বুকে নিয়ে আমি কেঁপে উঠি।

তোমার দেহকে আমি ছুঁই ;
তোমার স্তনের ওপর হাত রাখি –
কৃষকের হাত স্পর্শ করে যেমন তার ধানের শীষ ,
তবু যতোবার জাহাজ ভাসাই তোমার উপকূলের দিকে,
চারিদিকে শুধু জলে ডোবা অগ্নিগিরির গর্জন ,
আর ঘূর্ণি, আর মৃত্যু !
কোথায় আমার মাটি, আমার আশ্রয়, আমার স্বপ্ন !
এই শূন্যতা আমাকে প্রহার করে।
যেন দিনের পর দিন আমার ছিল শুধু কাঠামোয় খড় বাঁধা,
আর ঐ কাদা-ছানা, ঐ রঙের আয়োজন ;
আর আরূঢ় এখন তুমি বেদীর ওপর অলৌকিক ,
আর তোমার চোখে তুলির শেষ-টান এঁকে আমি অসহায়,
ন্যুব্জ শীর্ণ কারিগর, দাঁড়িয়ে আছি ধুলোর ওপর, একা ,
যেন কোটি কোটি আলোকবর্ষেও রচিত হয় না আমাদের সাঁকো
ছুঁতে পারি না আজ আর তোমাকেও !

২

মনে পড়ে সেই আমার গুহাবাসের দিনগুলি...
সারাদিন শুধু কুটিলা নাগিনীর-মতো বিদ্যুৎ, আর বজ্র, আর বৃষ্টি,
যেন ছয় ঋতু গালিয়ে শুধু বর্ষা, সারাবছর...সারাবছর,

আর প্লাবন আর অন্ধকার আর কোটি কোটি গাছের অরণ্য,
আর দিকে দিকে শুধু দাবানল, আর ভূকম্পন আর ধ্বংস,
আর গুহার উদরে সিক্ত পশুর মতো উলঙ্গ আমি, মানুষ .
চারিদিকে শুধু অতিকায় সরীসৃপের নিশ্বাস আর হিংসা আর চিৎকার!
আর আমার ক্ষুধা, আমার নির্জন, আমার ভয়! ··
এই রাক্ষসী পৃথিবীর হিংস্র উদাসীনতায় মরীয়া
বুকের হাড় থেকে উপড়ে আনলাম আমি তোমাকে –
হে আমার উদ্ধার, আর রচনা, আমার প্রেম,
রোপণ করলাম তোমাকে আমার স্বপ্নের কেন্দ্রে ,
আর তুমি নারী, তোমার ওষ্ঠে একি বিদ্যুৎ·· শোণিতে আমার সাহস···
দৃপ্ত তেজে ধারণ করলাম পাথরে-গড়া কুঠার,
আর প্রকৃতির মুখোমুখি আমি, তোমার জ্ঞানফলের রসায়নে বলীয়ান,
জ্বলন্ত মশাল হাতে পাতাল থেকে ছুটেছি স্বর্গের দিকে,
আর ঈশ্বরের প্রাসাদে আমি প্রতিবাদ –
পাপের দুঃসাহসে হাতে তুলে নিয়েছে আইন,
আর প্রতি পদক্ষেপে সেদিন খুলে গেছে দরজার পর দরজা,

দরজার পর দরজা···

আর বিজয়ীর মতো আরোহণ করেছি তোমার মিনারে,
আকাশের বুকে উড়িয়ে দিয়েছি আমার নিশান –
আমি এসেছি!

সে বিস্ময়, যেন আবিষ্কার!
লোহাকে হাতে তুলে নিয়ে বলেছি, তুমি হও! –
আর দৈত্যের মতো নতশির, শক্তিকে বহন করেছে সে তার মাথায়,
আমি জলের শরীর থেকে টেনে বার করেছি বাষ্প,
আমি চুম্বকের আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে এনেছি বিদ্যুৎ,
আর তুমি, নারী – আমার প্রকৃতি, আমার প্রিয়া –
আমার মাথার ওপর পরিয়ে দিয়েছ সেদিন সোনার মুকুট,
আর কানে কানে বলেছ – আমার রাজা!

কী উল্লাসে মথিত করেছি সেদিন তোমার হৃদয়,
জন্মাতে চেয়েছি তোমার প্রেমে। ··

আর আজ, প্রাকারের বাইরে আমি ভিখারী,
তোমার উৎসবের উল্লাস খড়্গ চালায় আমার শরীরে,
আমি ছিন্ন।
কবন্ধের মতো পড়ে আছে ঐ আমার শরীর—
ধুলোয় আর রক্তে আর অবহেলায়,
তুমি নিষ্ঠুর!

৩

আমার যন্ত্রণা আমাকে ঘুমোতে দেয় না—
সেই ঘুম যা জননীর মতো ধারণ করে আছে এই সংসার,
প্রতিটি রাত্রির শিয়রে যা রূপকথার মতো অবারিত,
চেতনার গভীরে যা সেবার মতো,
অন্ধকারের মাটিতে যা শিকড়ে শিকড়ে ঢেলে দেয়
সবুজ হয়ে ওঠার উদ্যম—
পাথরে পাথরে বন্দী আমি, পৌঁছতে পারি না সেই আকাশে।
আমার সমস্ত বেদনা শুধু পাখা ঝাপটায় এই খাঁচার ভিতরে!

আর তুমি, অপরূপ দুটি আয়ত চোখ মেলে, নারী,
চেয়ে আছ আজ কোন্ দিগন্তে?
রাত্রির স্নায়ুর ভিতরে ঝিঁঝির শব্দের মতো
আমার শোণিতে শুধু আজ তোমারই ঝঙ্কার!···
আমার পাঁচটি কামনাকে যেন একই শরীরে তৃপ্ত করেছ তুমি
দ্রৌপদীর মতো;
আমার মৃত্যুর শিয়রে তুমি সাবিত্রী, ফিরিয়ে এনেছ আমাকে
যমের দরজা থেকে;

ভীমা তুমি, ভৈরবী, খড়্গ ধরেছ আমারই শত্রুর সংহারে—
তোমার দৃপ্ত তেজের প্রতি পদক্ষেপে তুমি রুদ্রমধুর,
কেঁপে উঠেছে তোমার স্তনাগ্রচূড়া
তোমার তৃতীয় নয়নে জ্বলে উঠেছে আগুন,
আবার আমারই স্বপ্নের জননী তুমি
মাটিতে লুটিয়ে কেঁদেছ তারই হত্যার শোকে সুভদ্রা!
জানি, আমার প্রেমে দেবতাব চক্রান্ত ব্যর্থ করে
দময়ন্তীর বরমাল্য দিয়েছ তুমি আমাবই গলায়,
আমারই ক্ষুধার লড়াইয়ে ব্যাধের অরণ্যে তুমি বধূ আমাব
ফুল্লরাব ঝাঁপি ব'য়ে ঘুরেছ তুমি আমারই পাশে কাঁটার পথে,
আর আজ, আমার তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে-আসা
লাবণ্যেব প্রতিমা তুমি, উর্বশী,
আমার উত্তোলিত বাহুর শেষ করাঙ্গুলি থেকে মুক্ত ঐ তোমার আঁচল,
আরূঢ় হয়েছ তুমি আকাশে,
আমার চিৎকার শাণিত বর্শাব মতো উন্মাদ,
ছুটে চলেছে আজ শূন্যে—
তুমি কোথায়?

৪

কোথায়, কোথায় তুমি নারী, আমার উদ্ধার?
কোথায় তোমার করুণার অবারিত প্রপাত!
এই বাঁজা মাটির খোয়াই, আর উলঙ্গ ক্ষতচিহ্নের মতো ভূমিক্ষয়—
কতোকাল আর আমি ধারণ করব আমার বুকে?

আমি যেদিকে চোখ মেলি, শুধু তুমি!
পৃথিবীর যতো মাঠের ওপর পেতেছি আমি রেললাইন
দেখেছি তুমি ধোঁয়ার মতো এলোচুলের রাশি উড়িয়ে
ছুটেছ যেন কিশোরী মেয়ের লাবণ্যে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,

বাঁধের পর বাঁধে কংক্রীটের বাহুতে ধরা পড়েছ তুমি নদী,
স্লুইস-গেটের ফাঁকে ঢেলে দিয়েছ তোমার উচ্চকিত খুশির উল্লাস ;
আমার সমস্ত নিঃসঙ্গতার কেন্দ্রে তুমি গান গেয়ে উঠেছ বেতারে বেতারে ;
দুঃখে আমার টেবিলে রেখেছ প্রিয়জনের ফোটো,
যন্ত্রে যন্ত্রে বুনে গেছ তুমি বিদ্যুতের সুতো,
বাসরঘরে নববধূর মতো উদ্‌ঘাটিত করেছ পরমাণু-হৃদয়ের বিস্ময় ;
আবার রুখে উঠেছ তুমি বিস্ফোরণে, উড়িয়ে দিয়েছ ঐ অবাধ্য খনির পাথর ;
চিরদিনের আহ্বান তুমি, তোমারই খোঁজে আমি মহাকাশ থেকে মহাকাশে
তোমার বুকের মধ্যে আমি ভারহীন, যেন পুতুল,
শূন্যে ঝাঁপিয়ে তোমারই ভালোবাসায় জেনেছি আমার দ্বিতীয় জীবন।
তুমি অপরূপ !

জানি তুমি কতো বিরাট, কতো দুঃসহ !
তবু কোটি কোটি ছুটন্ত ঘোড়ার মতো উদ্দাম ঐ বিদ্যুৎ
কী করে ধারণ করেছ তুমি তামার তারের মতো তন্বী তোমার শরীরে।
বিস্ময়ে আমি হতবাক ! নারী,
আমারই বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়েছ তো তুমি একদিন,
আমার এই আর্ত দুঃসময়ে
কোথায় চলেছ তুমি, কোথায় ?

দিনের পর দিন তুমি বদলে যাও,
বদলে যাও আমার চোখের সামনেই।
তুমি, চিরদিনের প্রেয়সী আমার,
পিকাসোর ছবির মতো বদলে ফেলেছ তোমার আদল,
তোমার মুখের মধ্যে ভেসে উঠেছে আজ শত শত মুখের উদ্ভাস ;
চিনতে পারি না তোমাকে, ছুঁতে পারি না।
তোমার নতুন নামের বন্যা ভাসিয়ে দেয় তোমার পুরনো নাম ;
তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি বিপন্ন,
বিদেশীর মতো ভাষাহীন।

কবে যেন আমারই প্রেমে তুমি আকাশে রেখে গেছ জ্যোৎস্না ;
আমারই অশ্রুর সাগর থেকে তুলে এনেছ মুক্তো ;
পাখির কামনা নিয়ে যতোবার আমি উড়ে গেছি তোমার জানালায়
বিম্ববতী তুমি, শুনিয়েছ আমাকে রূপকথা ;
আমারই জন্যে প্রদীপ তুলে দাঁড়িয়ে থেকেছ দরজায়—
তোমার এই স্বপ্নগুলোকে আমি টাঙিয়ে রেখেছি অবচেতনার দেয়ালে,
সেখানে চোখ রাখলেই প্রতিমার জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে
উদ্ভাসিত হতো তোমার মুখ,
ধ্বনিত হতো তোমার নিশ্বাস আমার রক্তে,
আমি বেঁচে উঠতাম।

৫

আর আজ তুমি, নারী,
তোমার দিকে তাকিয়ে আমি অসহায়—
যেন হেষ্টিংসের সেই ডুয়েলের তরবারি হাতে
হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি এই বিশ শতকে ;
আমার চোখের সামনে রাত্রির স্কাইস্ক্র্যাপারের মতো
আলোকিত শত শত জানলায় রহস্যময়ী তুমি, দুর্বোধ,
ঘড়ির কেন্দ্র থেকে উৎসারিত দুটি কাঁটার মতো
সময়ের ওপর দিয়ে আমি শুধু অন্ধের হাত বুলাই,
জানি না তোমাকে, চিনি না,
তোমার দৃশ্য থেকে দৃশ্যে যেতে আমি হোঁচট খাই।

তোমার নতুন পথের তেমাথায়
আমি গেঁয়ো মানুষের মতো নাজেহাল,
চেয়ে দেখছি তোমার খেলা, দেখছি—
ফুটপাতের ঘাম আর চিৎকার থেকে
কোণাচে হয়ে উঠে আসছে তোমার কবিতা ;

ক্যাবারের কোমর-দোলানো নাচে উলঙ্গ তুমি, উন্মাদ,
আমার রুচির ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছ ছিটকে পড়া ঝাড়লণ্ঠনের শাণিত হাসি,
আবার নীল রুমালে জড়িয়ে তোমার অবাধ্য চুলের দীপ্তি
মাঠের পর মাঠে চালিয়ে যাও তুমি ট্র্যাকটর,
ঝাঁপিয়ে পড়ো সমুদ্রের বুকে ডুবুরী,
আর হাজার ফুট অন্ধকারে জলজ উদ্ভিদ আর তারামাছের জগতে তুমি নতুন
তারা

তোমার এই বিপরীত, এই সংঘাত,
ছুঁচের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাকে উটের মতো।
আমার সারা তৃষ্ণায় এখন শুধু জলের ঘ্রাণ।

জানি, আমারই শ্রমের ফসলে ভরে তুলেছ তুমি তোমার ভাণ্ডার,
আমারই বুকের তৃষ্ণা আর পেশীর উল্লাস
জেহাদী ভালোবাসা আর মনীষার তীক্ষ্ণ প্রহারে
গুঁড়িয়ে দিয়েছি আমি অবরোধের প্রাকার, বাড়িয়ে চলেছি সীমানা,
চেতনার গলিতে গলিতে জ্বালিয়ে তুলেছি আমি মশাল ;
যন্ত্রের পর যন্ত্রে, আয়ু আর আরোগ্য, মেধা আর ধ্যানে
মেলে ধরেছি আমার মণিপদ্মের পাপড়ি।
তুমি এসেছ।
আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সারা শরীরের অনুভবে টের পাই, তুমি এসেছ
আমাকে দেখতে দাও।

৬

দেখতে দাও আমাকে তোমার ঐ মুখ,
আমাকে বদলে দাও।
তোমার ঐ নতুন মাটিতে, আমাকে যুক্ত করো।
ত্রিশূলে বিদ্ধ করো আমার এই হৃদয়, আমাকে মুক্ত করো।

পাথরে পাথরে ঘর্ষণে তুমি আগুন, তুমি নতুন ;
তোমার ঐ ত্রিতল রূপের কোণাকুণি আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্বোধ ;
কী কথা বল তুমি, নারী,
কী কথা ?··

আমি যেদিকেই কান পাতি, শুধু চিৎকার।
আপিস আর আদালত থেকে, হাসপাতাল আর মন্দিব থেকে,
চিৎকার ফেটে পড়ছে ফ্যাক্টরির সাইরেনের মতো তীক্ষ্ণ।
নীরবতার অনিদ্র রাত থেকেও চুঁইয়ে পড়েছে তার নির্যাস –
উন্মুক্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তেব মতো ফোঁটায় ফোঁটায় ,
চিৎকার গর্জে উঠেছে একবোখা বাপান্তে, মিছিলে আর বিস্ফোরণে
লাখো লাখো পায়েব তলা থেকে, বুকেব গহ্বর থেকে,
জিহ্বাব আঘাত থেকে কলরোল,
আর তখনি ঘন অন্ধকারেব অলিন্দ থেকে
কে যেন হেঁকে উঠল,
শোনো ঐ –।

৭

বেজে উঠেছে তোমাব ঘণ্টা।
এবার তবে বোধন!···

কোলাহলের হট্টরোলে
ঠেলাঠেলি আর হাতাহাতি, হারিয়ে যাওয়া আর এগিয়ে আসার ভিড়ে
জ্বলে উঠল ঐ তোমার উৎসব –
তরঙ্গের সমুত্থিত শিখরে আরূঢ় এখন তুমি, নারী,
প্রতিমার মতো আলৌকিক।

আর আমি, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ন্যুব্জ শীর্ণ কারিগর,
ভ্রূণের মতো প্রতীক্ষায় আমি তোমারই সামনে,
অজানা জন্মের দ্বারে স্তব্ধ।
জায়া তুমি, এসো, আমাকে পার করে-দাও ঐ তোরণ
আমার চারিদিকে আজ কালো অন্ধকারে জ্বলে
কোটি কোটি বিস্ময়ের সৌরপ্রদীপ!
কী মহান আরতি তোমাব
শতাব্দীর সিঁড়িতে আজ উদ্‌ঘাটিত ঐ নক্ষত্রসভায়।
আমাকে গ্রহণ করো, নারী যোগ্য করো।
আমার এই বুকের খাপ থেকে ঝলকে উঠুক তোমার
উলঙ্গ তরবারির মতো স্তোত্র--
আমাকে জাগতে দাও॥

এই আমার বিষ আমার জীবন

তারই জন্যে আমি

তারই জন্যে আমি,
আমার মন, আমার জীবন,
সে আমার পৃথিবী, আমাব স্বপ্ন, আমার অশ্রু,
ঐ বোকা মেয়ে, ঐ রোখা মেয়ে,
তারই ডাকে জেগে উঠেছে আমার যৌবন।

আর সে কি আগুন, এমন শিখার মতো দাউ দাউ,
সে কি পাগল, তার শরীরে এমন ঘূর্ণি,
কোনো গানই তার গান নয়, তর্ক নয় তার তর্ক,
ফাল্গুনে পলাশ ছড়িয়ে আশ্বিনের এই শিউলি,
আর আলতামিবার গুহায় আঁকা ছুটন্ত যেন বাইসন,
আর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে নিজেই নিজের দেহে,
আর কোনো ধাঁধাই তার ধাঁধা নয়, প্রহেলিকাও নয় অতিনাটক,
আমরা যারা চোখ তুলি, তার খেলাঘরের পুতুল,
হঠাৎ যদি প্রেমিক হই, নিতান্তই সে বোকা মেয়ে
বোকা কিম্বা রোখা, বোবা এবং কালা,
আব বুকফাটা গান আমাদের আদিবাসী যুবক,
টিলা থেকে টিলায় যেন মাদল এমন আদিম,
    আমি তুমার পীরিতের লা ার বটে হে—
    তুমার মনের তলতালাশ পাইলম নাই!
আর সমস্ত অশ্রুই অতএব ফেটে পড়ে এমন বারুদ!
আর তারই জন্যে আমি,
আমার মন, আমার জীবন,
যেন আকাশজোড়া মাকড়শার রাশিচক্রে ক্ষমাহীন
আগুন-রঙা পতঙ্গ, যেন সন্ধ্যাবেলার সূর্য,
তার আর্তনাদ কারো কানে যায় না,

সে তো অনিদ্রা শুধু রাত্রির,
আর ছটফট তার ডানা, আমার মাথার মধ্যে ছটফট,
আর তারই জন্যে আমি, আমার জীবন,
দূরবীণে চোখ রেখে, নাকি বুকের পরে বুক,
সে আমার নতুন, যেন কোটি তারার আড়ালে তার আভাস,
রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কাটাকুট রেখার ফাঁকে ইশারা,
আর আলোকবর্ষের সাঁকো পেরিয়ে ছুটে চলেছে আমার দৃষ্টি,
ব্রহ্মাণ্ডের ধনুক থেকে বেরিয়ে ব্রহ্মাণ্ডপারের ধনুকে,
আর কী অবাক, সে রয়েছে এখানেই,
যেন পেছন-থেকে-গলা-জড়িয়ে-ধরা কোনো নারীহৃদয়ের নিশ্বাস,
কী নীরব আর অভ্রান্ত তার ধরণ,
যেন হাতের ওপর আমলকী, তাকে ধরা যায়!
আর তারই জন্যে আমি,
আমার মন, আমার জীবন,
সে আমার পৃথিবী, আমার স্বপ্ন, আমার অশ্রু,
তাকে বুকে নিয়েও ঠিক বুকে নেই,
যেন চোখের সামনেই ঘর্ঘর, মাটি চৌচির,
আর পাতালে গেলেন সীতা,
সময়ের ফাঁক দিয়ে-তেমনি মিনিটে উধাও,
আর তারি জন্যে আমি, আমার মন,
আলতামিরার গুহা থেকে বেরিয়ে ব্যাবিলনের বাগানে,
আর ইতিহাসকে মালায় গেঁথে
ছুঁচ বিঁধিয়েছি তার গায়ে—
সে আমার স্বপ্নের ঝিনুকভাঙা হালকা-নীল মুক্তো,
সে আমার কামনার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা

বত্তিচেল্লির ভেনাস,

চিতার মতো চতুর আমি, রক্তে শ্বাস ফেলে শুধু তৃষ্ণা,
হরিণী জানে না তার আপন মাংসই তার বৈরী,
আর বুকের মধ্যে হঠাৎ ঝিকিয়ে উঠছে একি বিষাদ!

২

তবু বিষাদ আমাকে বাঁধে না

যেমন বোধিদ্রুমের ছায়ায় বসেন বুদ্ধ,

আর ক্রুশকাঠের পেরেক থেকে

ত্রাণ করেন যেমন যীশু,

আমি হটুগঞ্জের রসুল, আমি দরমাহাটার কানাই,

জরা আর মৃত্যু আমার

খেলা করে না নারীর দুই স্তনে,

রুটি আর মদের মধ্যে

রেখে যেতে পারি না আমার মাংস আর রক্ত,

বিষাদ আমার তেমন নয় যাতে মানিক বাড়ুজ্জের কুসুম

টকটকে তাতানো লোহার মতো প্রেম দেখেছে ঠাণ্ডা,

বিষাদ আমার তেমন নয় যাতে জীবনানন্দের নায়ক

জানলায় উটের গ্রীবার মতো মৃত্যু দেখে

ঝুলে পড়েছিল অশথ গাছের ডালে .

আমি আসানসোলের হেমব্রম, কিম্বা কার্শিয়াঙের গুরুঙ,

রথের মেলার মুনিয়ার মতো এক খাঁচাতেই হাজার,

কি আমার ভাষা, আমার আচার, আমার পোশাক,

আমি কি একটা মানুষ, নাকি মানুষের মতো ছায়া,

যেন মাঘ মাসের মাঠের ওপর রেশমী নরম কুয়াশা.

আর তারই ভেতরে যাতায়াত, যেন এই আছে আর এই নেই,

ঐ হটুগঞ্জের রসুল, ঐ দরমাহাটার কানাই,

ঐ আলতামিরার বাইসন, আর লাফিয়ে-পড়া বাঘ,

আমি এ সবই এবং কিছুই-নই, ছায়া,

আমার বুকের ভেতর ঢুকে

আমার পিঠ দিয়ে উড়ে যায় রথের মেলার মুনিয়া,

আমার শরীরের মধ্যে তোরণ খুলে বেরিয়ে যায়

জনস্রোতের মিছিল,

আর আমার প্রেম তাই এত উধাও, ঐ বোকা মেয়ে,

ঐ রোখা মেয়ে,

সে কি কমলেকামিনী, সে কি ধাঁধা,
হাতির মতো গিলছে আর উগরে ফেলছে আমাকে বারবার,
আর বদলে ফেলছি আমিও তাই আমার মুখোশ,
আর জ্বলে উঠছি বারবার
যেন আকাশজোড়া মাকড়শার রাশিচক্রে ক্ষমাহীন
আগুনরঙা পতঙ্গ, নাকি সন্ধ্যাবেলার সূর্য,
আর, কোনো গানই তার গান নয়, তর্ক নয় তর্ক,
আর তারই জন্যে আমি, দিনের পর দিন এমন…

৩

বিষয়টা সমঝে নিন, আমি একটা মানুষ
গায়ে গতরে বেঁচে রয়েছি, নামও একটা আছে বৈকি,
জন্মেছি শীতলাইয়ে, আর হালসাকিন কলকাতা,
পোস্টাপিসের পিওন আমাকে সনাক্ত করে চিঠি দেয়,
বিষ্ণু দের বাড়িতে গেলে কফি,
আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে চা,
আর আমার বান্ধবীর বন্ধুরা
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ঐ সেই !
কিন্তু শিশু যেমন মেঝের ওপর আঁকড়ে ধরে রোদ্দুরের টাকা
আর মুঠি খুললেই নেই, সেই মেঝের ওপর লাফিয়ে পড়ে টাকা,
আমিও তেমনি নিজেকে ধরতে নাজেহাল
মনের উদুখলে ভেঙে ভেঙে হচ্ছি হাজার।

বিষয়টা সমঝে নিন, আমি একটা মানুষ,
জন্মেছি শীতলাইয়ে, কিন্তু জেরুজালেমে হলেও ক্ষতি ছিল না,

কিম্বা মায়া দেবীর কাননে, আমি সেখানেও সেই প্রেমিক,
আবার প্রেমকেই এড়িয়ে খুঁজি ঢালের অন্য দিকটাও,
আর ঐ বোকা মেয়ে, ঐ রোখা মেয়ে,
তর্কটা তবু থাকছেই, গানটা বেজে যাচ্ছেই,
আর মনের মধ্যে ঝিনুকভাঙা হালকা-নীল মুক্তো
কিম্বা সমুদ্র-থেকে-বেরিয়ে-আসা বত্তিচেল্লির ভেনাস,
ঐ আমার পৃথিবী, আমাব স্বপ্ন, আমার অশ্রু,
আহা, আদি কবিব হবিণী, সে যে আপন মাংসেই বৈবী,
আর চিতাব মতো চতুব আমি, ইতিহাসের গুল্ম থেকে গুল্মে
আড়াল দিয়ে হেঁটে আসছি, হেঁটে আসছি রাতদিন,
বক্ত-পাগল-কবা এই তৃষ্ণায়, আমি ভেঙে যাচ্ছি বাববাব

ভেঙে গুঁড়ো হচ্ছি আব ভাসছি আমি হাওয়ায়,
যেন দিল্লিব আঁধিঝড়ে ছড়িয়ে পড়া ধুলো,
শুধু মেঝেয় নয়, কিম্বা নয় শুধু টেবিলে আর বিছানায়,
আছি বুড়োবাবু পাঁজিতে. আর গিন্নিমাব পাকা চুলে,
কিম্বা খোকন সোনাব লাল জুতুয়ায়
আর দিদিমণিব ব্লাউজে,
ধুলো সর্বত্রগামী, নখে এবং জিবে,
ধুলো চোখের মধ্যে এবং ঢুকে যাচ্ছি বক্তে,
আব আমি, আমিও ছুটছি ধুলোয়,
বার্লিনের তুষাবপাত দেখে হোটেলের জানালায় যেমন একদিন,
কিম্বা মুঙ্গেবে গঙ্গার বুকে গৈবীনাথ পাহাড়ে
কালের হ্রেষাধ্বনিতে বুকেব মধ্যে আমি ভয়ার্ত,
ছুটে চলেছি ক্ষ্যাপাব মতো সালতারিখ থেকে দ্রাঘিমায়,
আব মুখোশগুলো পরছি আব উড়ে যাচ্ছে টুপির মতো ঝড়ে।

আর ঐ বোকা মেয়ে, ঐ বোখা মেয়ে
কোনো গানই তাব গান নয়, তর্ক নয়-তর্ক,
তারই জন্যে আমি, আমাব জীবন,

ধুলোর মতো ভাসছি যেন সালতারিখ থেকে ব্রাহ্মিমায়,
আমি হটুগঞ্জের রসুল, কিম্বা দরমাহাটার কানাই,
আমি লণ্ডনের টিউব স্টেশনে প্রেমিক জুটির—বাই বাই!
আর রোমের কলোসিয়ামে নিগ্রো যুবকের বিস্ময়,
আর প্যারিসে সীন নদীর ব্রিজে জিপ্‌সি মেয়ের উচ্চ হাসি,
আমি মস্কোর রেড স্কোয়ারে নীল পায়রার ভালোবাসা,
আর গিজার পিরামিডের ওপর আকাশজোড়া বিষাদ…

৪

তবু বিষাদ আমাকে বাঁধে না,
আমি আসানসোলের হেমব্রম,
জরা আর মৃত্যু আমার খেলা করে না নারীর দুই স্তনে,
আমি কার্শিয়াঙের গুরুঙ
রুটি আর মদের মধ্যে রেখে যেতে পারি না
আমার মাংস আর রক্ত,
আমি বম্বের মালাবার হিল-এ
কালো চশমার সিনেমা হিরো,
আমি ভিলাইয়ের লোহাকলে ছত্তিশগড়ী কুলি,
আমি কলকাতার তারাশোভিত হোটেলে
আধা-উলঙ্গ ফ্লোর শো-র মক্কেল,
আমি বিহারের খরায় মরা অস্থিসার চাষী,
ধুলোর মতো গুঁড়ো হচ্ছি আর ভাসছি আমি হাওয়ায়
ধুলো সর্বত্রগামী, নখে এবং জিবে,
ধুলো চোখের মধ্যে এবং ঢুকে যাচ্ছি রক্তে,
তোমাদের মধ্যে আমি এবং আমি তোমাদেরও,
ঐ তোমার খালি পেটে কফির সময়
আর ধার-করা সিগারেটে কাপ্তেনী,
আর বান্ধবী নিয়ে উধাও ঐ ময়দানের অন্ধকারে,

তোমার মধ্যে আমি এবং আমি তোমাদেরও,
আমি ডালহৌসির মেয়ে কেরানী,
আর বন্ধু জুটিয়ে 'চাইনিজ'
আর বাড়ি ফিরে বাসন মাজতে মাজতে
গেয়ে উঠি, দম মারো দ-অ-ম্।......
ধুলোর মতো ভাসছি আমি, ঢুকে যাচ্ছি রক্তে,
সকলের মধ্যেই আমি, এবং সকলেই আমার মধ্যে,
তবু রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারি না কেন—
আনন্দই আমাদের গান ?
হুইটম্যানের মতো দাঁড়াতে পারি না কেন
ঘাসের মধ্যে মরদ,
আর ঘাসের শীষ আমার উরুর পাশে আহ্লাদ।
আমার রক্তে কেন রাবণের মতো পতন,
মধুসূদনের হাতে গড়া সেই পাহাড় যেন রাবণ,
গুহার মুখে ঝড়ের মতো হাহাকার শুধু, চিৎকার।
আর যন্ত্রণা আমাকে ক্ষ্যাপায়, কাঁদায়, তাতিয়ে তোলে যুদ্ধে,
যুদ্ধ দিয়েই তাহলে আমার অধিকার !

৫

যুদ্ধ দিয়েই, তাই আমার যুদ্ধ
গাছের যেমন শিকড়, আর সাপের যেমন দংশন,
তার রাত্রির বুকে জেলে দেব আমি নিঘুম,
আর ডিনামাইটে পাথর ফাটিয়ে
সুড়ঙ্গ থেকে তুলে আনব সোনা,
আর প্রতিটি যজ্ঞের পূর্ণাহুতির
ভাগ নিতে আসব আমি দানব,
আর কেঁপে উঠবে আমাকে দেখে তার চোখের পাতা থরথর,
যেমন কেঁপে ওঠে ঠোঁটের ওপর

প্রথম প্রেমের ঠোঁট নেমে এলে কোনো কিশোরী,
আর আঙুরের মতো তাকে হাতে নিয়ে
আমি নিঙড়ে নেব তার মদ,
আর ঈশ্বরের ঠিক পাদপীঠেই প্রোথিত করব শয়তান,
যেমন পূর্ণিমার মুখের আড়ালে অমাবস্যার রাহু,
কিম্বা মৃত্যু যেমন মৃত্যুলগ্নে ফাটবে বলেই
জন্মলগ্নে রেখে যায় তার টাইম বোমার টিক্‌টিক্,
আর ইঁদুর যেমন খুঁজে বেড়ায়
পৃথিবীর যতো জ্ঞানী মানুষের বই,
চিতার মতো চতুর তেমনি, আমিও রয়েছি সজাগ,
হরিণী জানে না তার আপন মাংসই তার বৈরী,
আর ঐ বোকা মেয়ে, ঐ রোখা মেয়ে,
কোনো গানই তার গান নয়, তর্ক নয় তর্ক,
তারই জন্যে আমি, আমার যুদ্ধ।

বেছে নিলাম তবে আমার তূণীর,
আর ভরে নিলাম ধারালো যতো হাহাকার,
শান দিলাম খড়্গের মতো ধিক্কার,
মুখোশগুলো উড়িয়ে দিলাম টুপির মতো ঝড়ে,
আর ত্রাণকার্যের হেলিকপ্টার থেকে
বস্তা বস্তা ছুঁড়ে দিলাম আমার অবিশ্বাস—
অবিশ্বাস আর অশ্রু, অশ্রু আর স্বপ্ন,
পান্টারের লোভের তাড়ায় ছিটকে-পড়া রেসের ঘোড়া,
আমি হট্টগঞ্জের রসুল, কিম্বা দরমাহাটার কানাই,
আমি আবেগের তুঙ্গ মুহূর্তে সত্যজিৎ রায়ের ফ্রিজ্‌ শট্,
যেন আগুনরঙা পতঙ্গ, যেন সন্ধ্যাবেলার সূর্য,
আকাশজোড়া মাকড়শার রাশিচক্রে ক্ষমাহীন,
আজ আমারও তবে যুদ্ধ, আমি ঘুরিয়ে ধরেছি বিষাদ…

আমি ঘুরিয়ে ধরেছি বিষাদ যেন, রাবণ,
আমি প্রাজ্ঞ অথচ কামুক, আর স্থিতধী এবং বেপরোয়া,
পরাজয় সামনে জেনেই মৃত্যুর বর্ম দিয়ে বেঁধেছি আমার সাহস
আর আগুনের বেড়াজালের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছি রথ,
আমি গ্রীক ট্রাজেডির নায়ক, যেন পাহাড়,
আর ভূমিকম্পে ভেঙে-পড়া ঐ ফাটলে ফাটলে ঝড়,
আর সারারাত ধরে নেকড়ের মতো চিৎকার,
আমি কান্নাকে দুহাতে দুমড়ে ধ্বনিত করেছি প্রতিবাদ,
আমি প্রাজ্ঞ অথচ কামুক,
আর স্থিতধী এবং বেপরোয়া,
ঠাণ্ডা মাথায় পরাজয়ের বেড়াজালে দাঁড়ালাম এই স্বাধীন।

আর আমার পতনের দশ আঙুলে
আঁকড়ে ধরেছি আমি মাটি,
আর মাটির মধ্যে নখ বসিয়ে, দাঁতে কামড়ে মাটি
বুকের মধ্যে দাউ-দাউ ঐ বোকা মেয়ে, ঐ রোখা মেয়ে,
শরীরে পাগল ঘূর্ণি ঘোরানো ঐ বোবা মেয়ে, ঐ কালা,
তারই টানে আমি খেলাঘরের পুতুল থেকে প্রেমিক,
তারই সামনে যুদ্ধ ঘোষণা, জয়ধ্বনি, এই চিৎকার—
তারই জন্যে আমি, আমার জীবন!

আর স্বর্গের সিঁড়ি আমার স্বর্গ ছোঁবে না বলেই
বেহায়া, কামুক, বীর, পরাজিত—
থাকবে আমার স্পর্ধাও!

সবগুলো তাস আমারই টেবিলে

যেমন তোমার দিনকাল, যেমন তুমি অস্থির,
সারাজীবন বাজি ধরে যা পেয়েছ তা তো এই… ।
তোমার জামার নিচে বেতের দাগ ;
তোমার গালের পাশে পাঁচ আঙুলের কালশিটে ;
আর তোমার চোখের সামনেই
ফাঁসিকাঠে উঠে গেল তোমার স্বপ্নগুলো ,
আর তোমার কলজে-পোড়ানো চেষ্টা
সে তো ফুটপাতের চোখটেপা আলোচনার ঝালমশলা ;
আর, যেমন তোমার দিনকাল, যেমন তুমি অস্থির,
সারাজীবন ভালোবাসা ফিরি করে
যা পেয়েছ তা তো এই – ।

এসো তাহলে এখানেই –
এই ময়দানের সবুজ রঙ জাজিমে
দ্যাখো, অন্ধকার বিশাল পাখির নিঃশব্দে
নেমে আসবে পাক খেয়ে এই মাঠে,
আর তোমাকেও কেমন টেনে নেবে তার ডানার নিচে
যেন আদিযুগের কোন্ আদিজননী
ধারণ করলেন তাঁর বুকে,
আর তোমার ক্ষতচিহ্নগুলো এখন নিরাময় ;
তুমি উত্তরে তাকাবে, ঐ
রজনীগন্ধার মতো প্রেম সেখানে হাতছানি
আর দক্ষিণে ঐ জীবন –
যেন পুরনো জুতোর ফিতেছেঁড়া তবু চলছেই,
আর পূবে ঐ টাহিটি দ্বীপের নকল ঘাঘরার ক্যাবারে,
আর পশ্চিমে, না, ওদিকে নয়,

গঙ্গা বড় কুহকিনী নদী,
ওর পাড়ে স্মৃতি, ওর পাড়ে চিতা, ওদিকে নয়,
এসো তুমি এই ময়দানে, এই ঘাসে,
বেঁচে থাকার তিন সত্যিতে
তিনটে দিকই তোমার আপন,
বুকের মধ্যে হাত দিয়ে দ্যাখো সেখানেও সেই ত্রিশূল,
তোমার কান্নার ওপর রুমাল বিছিয়ে
শুয়ে পড়ো বরং সটান।
আর আমিও রয়েছি এই কাছেই
তোমার ছায়ায় ছায়া, তোমার বুকের মধ্যে, মনে ,
তোমার সবগুলো তাস আমারই টেবিলে, —
আমি জানি — ।

আমি জানি তোমার ঐ অস্থিরতা,
তোমার সারাজীবনের বাজি,
আর তার বখশিস, ঐ জামার নিচে বেত,
আর গালের পাশে পাঁচ আঙুলের কালশিটে,
আর যেমন তোমার দিনকাল, যেমন তুমি অস্থির,
রথের মেলার তাঁবুতে, সে তো তুমি ,
মাচার ওপর দাঁড়িয়ে, তুমি বাচাল,
আর তোমার মুখের ওপর খড়ি, খড়ি আর সিঁদুর,
আর আবোল তাবোল খেলতে গিয়ে পতন,
পতন আর হাসি, হাসি আর হাততালি,
কিম্বা পিঠের ওপর কুঁজ, তুমি বামন
আর বুকের ভেতর থেকে টেনে বার করো
তিন মাথাঅলা সোমথ এক মেয়ে,
আর তিন মুখে সে চুমু খায় তোমার গালে
আর ডুকরে ডুকরে কেঁদে লাফাও তুমি
যেন কুঁজঅলা এক ঘাসফড়িং, আর পতন,
পতন এবং মূর্ছা, মূর্ছা এবং হাততালি,

আর আমিও রয়েছি ঐ কাছেই,
তোমার ছায়ায় ছায়া, বুকের মধ্যে, মনে,
তোমার সবগুলো তাস আমারই টেবিলে ; আমি —
আমি জানি — ।

আমি জানি তোমার ঐ নিজের ওপর রাগ ,
যেমন ছেলেবেলার খেল্‌নাগাড়ি —
সে ছিল তোমার দু'চোখের মণি
আর তার চাকা ভাঙলেই দাঁড়িয়ে লাগাতে লাথি,
তোমার বুকের মধ্যে রয়েছে তেমনি
দু'মুখঅলা সাপ,
তার মাথার দিকের মুখ দিয়ে সে
কামড়ে ধরেছে ল্যাজের দিকে মাথা,
কার সঙ্গে লড়াই তোমার
কার জিৎ, কারই বা হার,
শুধু খনির আগুন ছড়াচ্ছে পাত'ল থেকে পাতালে,
সারাজীবন বাজি ধরে যা পেয়েছ তা তো এই — ।
তোমার সবগুলো তাস আমারই টেবিলে ; আমি
আমি জানি — ।

এসো তাহলে এখানেই,
এই ময়দানের সবুজ রঙ জাজিমে,
আর অন্ধকার বিশাল পাখির নিঃশব্দে
নামল ঐ ডানার পালকে নরম,
যেন আদিযুগের কোন্‌ আদিজননীর বুক ;
আর এখানে-ওখানে মানুষের শব্দ আর হাসি,
হাসি তার স্তব্ধতা,
স্তব্ধতা আর চাপা গলার গান —
'চোখে চোখে কথা বলো, মুখে কিছু বলো না',
আর স্তব্ধতা আর স্তব্ধতা,

আর মেয়েলি গলার 'প্লি – জ্'।
আর দশ বাজতেই মাঠ ফাঁকা, তুমি একা,
আর তোমার বুকের মধ্যে ঐ
মস্তাজের মতো মুখের ওপর মুখ,
যতো কোমল আর বিধ্বস্ত আশা,
আর ঝঞ্ঝাপীড়িত মধুরতা,
যেন মায়াকোভ্স্কির কবিতা,
যেন খনির আগুন ছড়িয়ে পড়ছে
পাতাল থেকে পাতালে,
আর এখানে-ওখানে মাটি ফেটে ফেটে লকলক
শূন্যের রস চেটে নিচ্ছে তার জিহ্বা,
যেন রবীন্দ্রনাথের ছবিতে জটিল
কর্কশতার লাবণ্যের সংঘর্ষের বিদ্যুৎ,
তোমার মনের মধ্যেও তেমনি এক সাঁওতালি বাঁশি, এবং
করাতকলের দাঁতাল মাতাল শব্দ,
আর খাঁচার মধ্যে বাঘের মতো
তোমার বুকের মধ্যে তোমার ঐ পায়চারি,
আর, যেমন তোমার দিনকাল, যেমন তুমি অস্থির,
সারাজীবন বাজি ধরে
যা পেয়েছ তা তো এই –।

ভালোবাসা, সে তো অনেক অনেক,
তার জ্বালা আর তার মধু,
যামিনী রায়ের আঁকা গোপিনীর মতো
আদল যাদের মুখে,
আর যাদের বুকের মধ্যে লেডী ম্যাকবেথ
ঘুমের মধ্যেও হেঁটে যাচ্ছে,
আর যারা প্রেমযোগিনী, সর্বদাই 'সখি ধরো ধরো,'
আর যারা ছেঁড়া শাড়িতেও ফিরে তাকায়
যেন তৈমুরের নাতনী ;

অনেক অনেক পেয়েছ তার জ্বালা,
জ্বালা আর তার মধু,
কেউই তোমাকে ধারণ করল না তার বুকের মধ্যে, মনে,
আর তাই তুমি এত অস্থির,
পেণ্ডুলামের মতো দুলে যাচ্ছো
ভালোবাসা থেকে ঘৃণায়,
আর বলির পশুর মতো মিনিটগুলোক
তাড়িয়ে নিচ্ছো বধ্যভূমির দিকে,
আর তবু তোমার ঐ হাসি, অমন ভাঁড়ামি, আর গান,
যেমন তোমার দিনকাল, যেমন তুমি অস্থির,
সারাজীবন বাজি ধরে
যা পেয়েছ তা তো এই — ।

এসো তাহলে এখানেই
এই ময়দানের সবুজ রঙ জাজিমে ;
পিঠের ওপর ঐ কুঁজ নিয়ে তুমি বামন
ঘাসফড়িঙের মতো কতো আর দেবে লাফ,
কতো আর লোক-হাসাবে ডুকরে-ওঠা কান্নায়,
অন্ধকারকে শুষে নাও বরং শিরায়,
আর নিজেকে নিজে করার ঐ ভিক্ষুক
তার পাঁজর ভেঙে টেনে বার করো
শিঙঅলা কালো যমদূত ,

বেঁচে থাকার তিনসত্যিতে
তিনটে দিকই তোমার আপন,
ত্রিপাদভূমিকে গ্রাস করো এবার সটান,
আর তোমার হাতঘড়ির ছেঁড়া স্প্রিং যাক
ছায়াপথময় ছড়িয়ে,
আর অন্ধকারকে জরির ফিতেয় বেঁধে
শাড়ির মতো উপহার দাও নতুন বৌয়ের বাক্সে,

আর মাটির ওপর ঠোঁট রেখে বলো, 'এসেছি'।
এই তো তোমার ইচ্ছে, এই ওষুধ, আমি জানি,
তোমার সবগুলো তাস আমারই টেবিলে, আমি -
আমি জানি- !

এই আমার বিষ, আমার জীবন

কার কাছে দাঁড়াব আমি এই রাতে –
এই অন্ধকারের কড়াইয়ে, কালো আগুনের তাপে উন্মাদ !
কার কাছে জুড়াব এই দাহ, যদি না তুমি আকাশ
নক্ষত্রের মশাল জ্বেলে অভ্যর্থনা করো আমাকে ?
আর, তুমি আমার মাটি, গ্রহণ করো আমাকে প্রিয়ার মতো ?
কার কাছে উন্মুক্ত করব এই আমার বিধ্বস্ত হৃদয় ;
কে আমাকে বাঁচাবে এই বিষের ছোবল থেকে ?
আমার শিরার মধ্যে আজ সময়ের সাপ ;
আমার বুকের মধ্যে তার চেরা জিহ্বায়
দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল চেতনা ;
ঐ কলার মান্দাসে ভেসে যায় আমার স্বপ্ন, আমার আগামী ;
আর শোকের তীর-বেঁধা অন্ধ বাঘের মতো নপুংসক আমার বিক্রম,
নাগিনীর পায়ে সঁপে দিয়ে আমার বাঁ হাতের ঐ পূজা
পালিয়ে এসেছি এই মিনারে, এই অন্ধকারের চূড়ায় !
কার হাতে তুলে দেব আমার এই পরাজিত হৃদয়ের অস্ত্র !

ও আকাশ, আমার জন্মদিনের প্রথম নিশ্বাস,
বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে তুমি
কোটি কোটি বছরের লুপ্ত জীবনের কান্নার আনন্দে ;
তোমারই জানলায় আমার প্রথম বিস্ময়,
আমার জেগে-ওঠা যৌবনের প্রথম আলিঙ্গনের চাপা
গর্জন তোমারই কানে।
আমার প্রথম অশ্রুর নিঃশব্দ ধ্বনিও
বাঁধা আছে জানি তোমারই বুকে।
আজ মধ্যজীবনের এই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে

শোনো আমার গ্লানি, আমার লজ্জা, আমার ক্রোধ—
শিকলে-বাঁধা একপাল হিংস্র কুকুরের মতো
দু'হাতে টেনে রেখেছি জন্তুগুলোকে আমার এই বুকের গহ্বরে,
উন্মত্ত চিৎকারে তাদের কেঁপে উঠছে আমার মজ্জা,
নখের আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন আমার শিরা উপশিরা।
আমি অটল ; দাঁড়িয়ে আছি যেন পাহাড় ,
কে জানে আমার এই বুকের নিচে অগ্নিগিরির গর্জন, এই লাভা।
আমার রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড আমি দু'হাতে চেপে
এই নিদ্রিত নগরীব ছাদেব ওপর
দাঁড়িয়েছি এসে আজ একা।
ও আকাশ, আমার আকাশ,
কাঁদিনি আমি, হারিনি ,
আমাব শেষ বিশ্বাসকে ধ্বনিত করে যাব তোমারই গম্বুজে।

আর, ও মাটি, আমার দেহকে ছুঁয়ে-থাকা মাটি,
তুমিও শোনো আমার এই সংলাপ,
যেমন করে শুনেছে আমার জায়া আমার শয্যায়,
শুধু বুকের ওপব বুক দিয়ে নয়,
নয় রক্তের শৃঙ্গারে শুনে রক্তের উল্লাস ;
আমার বিদীর্ণ লাঙলের আঘাতকে ঢেকে দাও যেমন তুমি শস্যে,
আমার বাড়িয়ে দেওয়া পায়ের পিছনে
যেমন তুমি ধরে থাকো দাঁড়িয়ে-থাকা পা,
আর দাঁড়িয়ে থাকা পায়ের শুশ্রূষায়
সঞ্চারিত করো রণতুরঙ্গের সাহস,
ও মাটি, তুমিও শোনো আমার এই পতনের চিৎকার ,
মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে যেমন আমি
কাৎরে উঠেছিলাম বেঁচে-ওঠার যন্ত্রণায়,
চেতনার এই দ্বিতীয় প্রসবে ছিন্নমূল আজ আমি
তোমারই করতলে ,
সময়ের বিষাক্ত নাগিনী আমাকে সাতপাকে জড়িয়ে

মুখোমুখি তুলে ধরেছে তার ফণা ;
আর, হা রে মানুষ, হা আমার তেজ,
তারই পায়ে দিলাম আমার বাঁ হাতে ঐ ফুল ;
আর আধখানা-বাজে-পোড়া বটগাছের মতো
পুড়ে গেলাম আমি আধাআধি ;
আমার এই যন্ত্রণা আমি প্রোথিত করে দেব কার বুকে ?
ও মাটি, আমার জন্মদিনের মাটি।

২

ওরা বলে, মৃত আমি, বাতিল।
তবে কেন এই গরল, এই দাহ আমার শিরায় ?
কেন সন্তাপ, এই দ্রোহ, আমার প্রতিবাদ ;
ফাঁদে-পড়া হাতির মতো বুকচেরা চিৎকারে কেন
কেঁপে ওঠে এই আমার বনস্থলী মন ?

যদি-না জ্যান্ত আমি, কেন তবে ঐ জান্তব আগুন
এমন করে পোড়ায় আমার স্নায়ু, এমন পীড়ন
যেন বুকের ওপর বসে কেউ টেনে বার করছে
আমার হিংসা, আমার ক্রোধ, আমার অভিশাপ,
আর চেতনায় সুড়ঙ্গ কেটে ঐ আমার পাতাল,
আর আমি যেন সেই স্বর্গ থেকে বিতাড়িত শয়তান -
অপমানের বজ্রগুলোকে পায়ের তলায় ফেলে
লাফিয়ে উঠতে চাইছি তার চূড়ায়,
আর প্রতিটি ধাক্কায় যেন কেঁপে উঠছে আমার সারাৎসার,
আর চোঙায় বাঁধা লাল-নীল কাচের মতো
ক্ষণে ক্ষণে বদলে ফেলছে তার বহুবর্ণ ছক।

আর, কী বাহার আমার এই যন্ত্রণার।
মুগ্ধ আমি, হা মোহিনী, পাপের নাগিনী,
ধিক্কার দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াই তোর ঐ ছলায়!
মেঘের ওপর হুমড়ি খেয়ে ফেটে পড়ে যেমন
পড়ন্ত দিনের সাতরঙা আগুন,
আমার মনের আকাশেও পেখম ছড়িয়ে দিল
তেমনি তোর ঐ দাউ দাউ জ্বলে-ওঠা কলাপ;
আর আমি, জাহাজ-ডুবির ভাঙা পাটাতনে ভাসতে ভাসতে যেমন
খুঁজে পায় কেউ কেউ অজানা দ্বীপের ডাঙা,
আমিও তেমনি তোরই আবিষ্কার,
তোরই আঘাতে আঘাতে ভয়াল,
ভেঙে-পড়া নদীর খাড়াই পাড়ে
গাঙ শালিখের খোদলে ভরা এই আমার মুখ,
স্রোতের ধনুকটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে
তার চাপের প্রতিরোধে আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রাণপণ—
কে জানে, নদী তার চূড়ান্ত কথা বলে যায়নি শুধু আমারই কানে
যেমন খড়্গ তার শক্তির শেষ পাঞ্জা রেখে যায়
টোল-খাওয়া শিরস্ত্রাণের স্ফুলিঙ্গে!

৩

স্ফুলিঙ্গই স্মৃতি এখন, কিংবা উল্কাবৃষ্টি;
আমি বুক চেপে তাই আজ দাঁড়িয়েছি এসে এই অন্ধকারে,
আর ঝড়ে-ছিটকে-পড়া ঈগলের মতো বিধ্বস্ত,
মিনারের চূড়ায় ফিরে দেখছি আমার আকাশ।......
শুধু নয় যৌবন, সেই সমুদ্র-দেখা অভিযান,
নয় সেই সপ্তডিঙার উথাল-পাতাল, উপকূলের খাঁড়ি,
আর অজানা বন্দরের বিদেশী মানুষ,

আর সোনা, আর ক্রীতদাস,
ভাষাহীন গণিকার চোখের বিদ্যুৎ,
আর জুয়া, আর অন্ধকারে ঝিকিয়ে ওঠা ছুরি,
নয় শুধু সেইসব পুরুষালি কামনার রোমশ উল্লাস ;
জীবন দেখেছি আমিও, তার ভেতর থেকে বাইরে,
যেমন খাটের তলায় আধো-অন্ধকারে ঢুকে
শিশু ভ্যাখে নতুন চোখে তার পরিচিত আঙিনার বিস্ময়,
আমি দেখেছি তেমনি করে মানুষ—
মানুষের ঘরে মানুষ, মানুষের বুকের মধ্যে মানুষ,
রক্ত স্মৃতি আর আগামী প্রজন্মের অভিযানের দিকে তার দ্যোতনা,
যেন টাট্টু ঘোড়ার বুকের পাশে গোড়ালির ইঙ্গিত ;
ধান কেটে, ধান তুলে, ইটের পর ইট সাজিয়ে মহান ;
রোদ্দুরে হীরের মতো 'চ্ছুরিত হয়েছে তার পরিশ্রমের ঘাম ;
আমি চোখ মেলে দেখেছি,
মাটির ওপর পা রেখে
তার পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার তৃপ্তি,
আমি হাত দিয়ে ছুঁয়েছি অন্ধের স্পর্শের মতো
নামহীন স্বপ্নের বিচিত্র কতো অবয়ব—
আর, রাত্রির নির্জন পথে দূর থেকে শোনা নর্তকীর নূপুরের মতো
জাগিয়ে তুলেছে তারা আমাকে আকাঙ্ক্ষায় ।
আমি ঘুমন্ত শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া বিদেশী সৈন্যের মতো
নিজের ভেতর থেকেই লুঠ করে এনেছি সোনা .
আর সে ঐশ্বর্যে ঝলমল করে উঠেছে
আমার যৌবদিনের প্রেয়সী—এই আমার সংসার ;
আর নাটকের রাজার মতো সিংহাসনের ওপর কাৎ হয়ে বসে
আমি হেসেছি।

সে হাসি কোথায় গেল, এই রাতে
এই অন্ধকারের ছাদের ওপর, একা,

সময় যখন বিষাক্ত নাগিনীর মতো সাতপাকে জড়িয়ে
মুখোমুখি তুলে ধরছে তার ফণা,
আর এই মধ্যদিনের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে
তাব চেরা জিহ্বায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল আমার চেতনা ;
যখন পরাজয়ের পায়ে সঁপে দিয়ে আমার বাঁ-হাতের ঐ পূজা
পালিয়ে এসেছি এই ধিক্কারে,
আর শিকলে বাঁধা একপাল কুকুরের মতো
হিংসা লজ্জা ঘৃণার আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন যখন আমার শিরা-উপশিরা,
কার করতলে পাব আমার এই জর্জবিত হৃদয়ের শুশ্রূষা ?
আমার বিগত দিনকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় দেখি
পাহাড়েরই মতো এক জল-বিভাজিকা,
আব করুণাব সমস্ত প্রপাত ঝরে যায় আজ অন্য দিগন্তে।

হা আমার পূর্ব-পুরুষ আমার আকাশভরা নক্ষত্র,
ক্রান্তিবলয়ের মাঝামাঝি আজ এই নোনাজলের সমুদ্রে
কোনদিকে ফেরাব আমার এই চিড়ধরা গলুই ?
রক্তের লোভে হন্যে হয়ে ছুটে আসছে হাঙর,
আর ঝড়ের দেব্‌তার বিদ্যুতের চাবুক খেয়ে
গর্জে উঠছে পিছমো ড়া বাঁধা ক্রীতদাসের মতো মেঘ ;
মারণের এই চক্রান্তে, ও আমার পিতৃপুরুষ,
তোমার আলোকস্তম্ভের বাতিগুলোও আজ
ঝনঝন আতঙ্কে ভেঙে পড়ল ঐ পাথরে ;
আর 'কে' বলে চিৎকার করে উঠলে
কারা ঐ দশদিক থেকে বিদ্রূপ করে—
'কে ?'

৪

প্রশ্নটা আমারও ছিল, তাই

শিলালিপির হরফে যাতে ঘোষণা করে তারা আমার নাম·

বাণিজ্য আর মন্দিরে,

কোটালের দরবারে আর শ্রেষ্ঠীজনের সভায় —

কাজকে খুঁজেছি আমি ; ছুঁড়ে দিয়েছি ঐ

জলদস্যুর বুকের দিকে রক্তাক্ত আমার বল্লম ;

আর, বাঁজা মাটিকে কেয়ারি দিয়ে ঘিরে

সাজিয়ে তুলেছি বাগান,

রাজনটীর চোখের মণিতে দেখতে চেয়েছি নিজের মুখ,

আর পোষা তিতিরকে কাঁধের ওপর বসিয়ে

বেরিয়ে পড়েছি শিকারে।

আর, লাথিতে লাথিতে আজ ভেঙে পড়ল

সেই আমার জয়স্তম্ভ !

কলার মান্দাসে ভেসে গেল আমার স্বপ্ন

আমার শিরার মধ্যে নড়ে উঠল সাপ ;

আমি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের শিখরে জেগে উঠেছি আজ একা,

আর মৃত্যু তার অমোঘ ত্রিশূলে আমার পাতাল থেকে

টেনে বার করেছে শয়তান,

আর আগুন-লাগা বাড়ির মানুষের মতো

দাউ দাউ সেই শিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে

উন্মাদের মতো বার করে আনতে চেয়েছি আমার

ঝলসে-যাওয়া যতো ভালোবাসা —

আর করুণার সমস্ত প্রপাত ঝরে যায় আজ অন্য দিগন্তে।

কার কাছে তবে দাঁড়াব আজ এই রাতে ?

কার কাছে উন্মুক্ত করব এই বিধ্বস্ত হৃদয়,

এই অন্ধকারের কড়াইয়ে কালো আগুনের তাপে উন্মাদ,
কার কাছে জুড়াব এই দাহ ?
পৃথিবীর সমস্ত ফুটে-ওঠা ফুলের পাপড়িতে আমার তৃষ্ণা।
সমস্ত পেকে-ওঠা শস্যের মধ্যে আমার ক্ষুধা ;
শিশুর গালে-নাক-ঘষা নতুন মায়ের মতো
নিবিড় হয়ে উঠতে চায় আমার মমতা ;
আমার সারাদিনের ক্লান্তিকে আমি ডানার ভিতর ভাঁজ করে
পাখির মতো খুঁজে পেতে চাই আমার শাখা .
আমি পাথরের বিরুদ্ধতাকে ছেনির দাঁতে ছিঁড়ে
খুদে বার করতে চাই আমার অবয়ব ;
আর এখন, আমার রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড দুহাতে চেপে
এই নিদ্রিত নগরীর ছাদের ওপর
দাঁড়িয়েছি এসে একা।
কার হাতে তুলে দেব এই আমার পরাজিত হৃদয়ের অস্ত্র ?
হারিনি আমি, ছাড়িনি,
আমার শেষ বিশ্বাসকে ধ্বনিত করে যাব কার কানে !

৫

হে আমার স্বপ্ন, আমার আগামী, আমার জীবন,
আমার ডান হাতে এখনো প্রোথিত করে রেখেছি মহাকাল।
আমি পাপের ছোবলে হুমড়ি খেয়েও
দেখতে পাই তার ফণার ওপরে মণি –
আর ধিক্কার দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াই তার ছলায় ;
আমার নিভন্ত হৃদয়ের মেঘের ওপর
পেখম ছড়িয়ে দিল তার দাউ দাউ জ্বলে-ওঠা কলাপ ;
আর সুন্দর কেবলি আমাকে মানুষের দিকে টানে ;
মানুষ আমাকে জাগিয়ে তোলে কামনায় ;

আর কোটি কোটি বছরের লুপ্ত জীবনের কান্নায়
আমি চিৎকার করে উঠি।

হে মানুষ, আমার নষ্ট দিনের সাহস, আমার প্রেম,
রক্ত ক্লেদ আর যন্ত্রণার মধ্যে
জন্ম নিতে চাই আমি তোমারই ঘরে।
তুমি দুর্গম অরণ্যের বুকে কোথায় রেখেছ তোমার নির্ঝর ?
আমি পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে
রাত্রির তৃষিত চিতার মতো
ছুটে চলেছি শুধু জলেরই আহ্বানে।

আর, এই আমার বিষ, আমার জীবন

পৃথিবী আমার, পৃথা

পৃথিবী আমার, পৃথা

১

আকাশ থেকে মাটির দিকে,
মানবী, তুমি ধারণ করেছিলে তার বেগ,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
লালন করতে পারো নি তবু তাকে বুকের তাপে,
আর ভেসে গিয়েছি আমি তাই নদীর জলে,
মৃত্যু আর জীবন আমার দু'দিকের প্রহরী,
একটা ছিন্নবৃন্ত জবার মতো তামার থালায়।

আর সারাজীবন আমি তাই মৃত্যুর নখর,
সারাজীবন আমি তাই জীবনের চিৎকার!
ঐ অপুত্রক বৃদ্ধ, আর সন্তানহীনা জরতী,
ঐ খর্ব বামন সংসার, আর
ঘোড়ার লাগাম ধ'রে দিনের পর দিন,
আর রাজার বাড়ির উচ্ছিষ্ট লাভের আহ্লাদ,
আমার তৃষ্ণার অঞ্জলিতে ঢেলে দিয়েছে জলন্ত অঙ্গার,
আমাকে খেপিয়ে তুলেছে তীরবেঁধা রণতুরঙ্গের ক্রোধে,
আমি বাজপড়া গাছের মতো
জ্বলতে জ্বলতে বলে উঠেছি – না,
আর পূর্বতোরণে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছি, ঐ আমি

২

ছাখো, পতন আমাকে ভীত করে নি,
জন্মে তো আমার বেজে ওঠে নি শাঁখ,

আমি অবাঞ্ছিত, তবু এসেছি,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
মানবী, তুমি লালন করো নি তাকে তোমার স্বপ্নে,
আর দিনের পর দিন আমি তাই ভেঙে যাই,
দিনের পর দিন আমি বিকার,
এই খর্ব বামন সংসার, আর আস্তাকুঁড়ের আহ্লাদ,
খুঁচিয়ে তুলেছে আমার আক্রোশ,
আমার কৈশোরের হরিণের বুক থেকে ন্যাখো
লাফ দিয়ে বেরিয়েছে একটা দাঁতাল শুয়োর,
আমি রুখে দাঁড়িয়েছি আমার নিয়তির মুখোমুখি,
এই বিশ্রী কর্কশ স্পর্ধা আমার আমরণ,
মানবী, তুমি চিরকালের জন্যে — চিরকাল
বঞ্চিত করেছ আমাকে আমার স্ব প্ন !

তবু,
এক-একটা সময় আসে, আমি
আমারও এ অনুর্বর টিলায়
যোজনের পর যোজন জ্বলে ফাল্গুনের পলাশ,
নদীর ওপর জ্যোৎস্নায়-ভাঙা ঢেউয়ের চূড়ায়
ঝলমল ক'রে ওঠে আমার যৌবন সম্রাটের মতো,
আর মুহূর্তগুলোকে দু-হাতের তালুতে পিষে
ফোঁটায় ফোঁটায় নিঙড়ে বার করতে চাই
আমি তার মদ

এক-একটা সময় আসে, আমি —
আমারও কামনা জাগে ফতুর হয়ে যেতে,
একটা উন্মত্ত বাঘিনীর হাঁ-এর গহ্বরে
ঢুকিয়ে দিতে সাধ যায় আমার মুণ্ড,

আর মানবী তুমি চিরকালের জন্মে — চিরকাল
বঞ্চিত ক'রেছ আমাকে আমার স্বপ্নে,
পাঁচজনের গলায় মালা পরায় যে নারী,
ঘৃণায় ছাখো মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও!

কিন্তু, কেন আমি তাকাব না
ঐ সুঠাম তন্বী শরীরে?
আগুন থেকে বেরিয়ে আসা—
যেন আগুনেরই এক নীলাভ শিখায় বন্দী,
ঐ কাশ্মিরী তুরঙ্গমার মতো সুশ্রী তেজের
দীপ্তি পাবো না আমিও?
কেন ভালবাসার জানালায় আমি
কোনদিন পাবো না আমার নির্বাচিতা হৃদয়ের
প্রতীক্ষা?
কেন সারাজীবন থাকবে আমার শুধু
জীবনধারণ আর বাঁচা?
ঐ রাজার বাড়ির উচ্ছিষ্ট লাভের আহ্লাদ
আর ঐ খর্ব বামন সংসার?
কেন দিনের পর দিন থাকবে আমার শুধু
হিংসে-ভরা জ্ঞাতিবিরোধের ইন্ধন,
আর ঐ ইতর লম্পট দাম্ভিকদের
ঘোড়ার লাগাম ধ'রে তোষামোদ,
সারাজীবন আমার শুধু এই পীড়ন,
এই নির্বাসনের হাহাকার?

ছাখো, মানবী, তুমি চিরকালের জন্মে — চিরকাল
বঞ্চিত ক'রেছ আমাকে আমার স্বপ্নে।
আমি জলের আশায় এগিয়ে গিয়েছি ঝর্ণার দিকে,

আর আমার তৃষ্ণার অঞ্জলিতে
ঝ'রে পড়ল ছ্যাখো জলন্ত অঙ্গার –
পাঁচজনের গলায় মালা পরালো, আর
ঘৃণায় ছ্যাখো মুখ ফিরিয়ে নিল প্রেম।
একি বজ্রাঘাতের দাহন, একি ধিক্কার!
আমি বজ্র দিয়েই ঢেকে দেব তার জ্বালা –
ঘৃণাই তাহলে সারাজীবন হোক স্তোত্র,
ঘৃণার চিতা দিয়েই আরতি করব আমি
বঞ্চনার ঐ অমাবস্যার মুখ!

৩

আমি তো চাই নি এই শ্মশান।
মৃত্যুতে কারই বা কী লাভ?
আমার ছিল সাতঘোড়ার রথ আর পূর্বতোরণ,
আমার ছিল সহজাত কবচকুণ্ডল আর একাগ্নী;
সূর্যকে হৃদয়ে ধারণ করেছি আমি প্রতিদিন,
প্রতিদিন আমি উজাড় করে দান করেছি
আমার অকৃপণ মমতা,
বিলিয়ে দিয়েছি এমন কি আমার বেঁচে থাকার বর্ম;
আর সারাজীবন তবু তোরণের বাইরে আমি ভিক্ষুক,
শুধু উচ্ছিষ্টের আহ্লাদ আর
মর্মযাতনার গোপন কীটের দংশন!
শুধু প্রতিযোগিতার আঙিনার বাইরে
আহত হৃদয়ের গর্জন! –
এই নিষ্ফল কামনা, এই পদাহত পৌরুষ,
আর দিনের পর দিন শুধু অভিশাপ,
আমার বুকের গহ্বর থেকে খুঁচিয়ে বার করেছে
মাতাল একটা রোখা শুয়োর,

আমার দাঁতের লাঙলে উল্টে ফেলব আমি পাতাল,
আর আমার নিয়তির বুকের ওপর
চাপিয়ে দেব আমি আমার বাঁ পা ;
এই বিশ্রী কর্কশ স্পর্ধা আমার আমরণ !

৪

না, আজ আর নয় তাহলে ভালবাসার কথা,
আজ ঘৃণা !
এই তিক্ত কষায় ওষুধ, হয়তো বিষ,
আমাদের ইতর লম্পট স্নায়ুতে আনুক
বিদ্যুতের চাবুক !
এই ঘিন্‌ঘিনে ভালবাসা, আর ঐ
চট্‌চটে রসের কলসে মাছি-আটকানো প্রহর,
বন্দী করে কেবলি আমাদের
খর্ব বামন সংসারে,
আর দিনের পর দিন আমরা কেমন
শিখা থেকে অঙ্গার,
আর অঙ্গার থেকে ছাই,
না আজ আর নয় তাহলে ভালবাসার কথা,
আজ ঘৃণা !

ভেবো না, আমি প্রলুব্ধ ঐ স্বর্গে,
তোমাদের ঐ শাল্‌মা-চুম্‌কি রাজবেশকে দেখেছি,
দেখেছি তার উপদংশ আর ক্লীবত্তাকে আড়াল
করার চেষ্টা ;
ভেবো না, আমি জানি না তোমাদের ঐ
নীতিবিহীন নীতি—

অন্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে
একশটা গোঁয়ার অন্ধ,
আর ধর্মপুত্র নিজেই যেখানে জুয়াড়ী,
কার যুদ্ধ, কেইবা জেতে,
এই রক্তাল্পতার অসুখে আক্রান্ত জগৎ,
এই স্বাভাবিকতার স্বাদ হারানো জিহ্বাগুলোর
তৃপ্তিবিহীন ক্ষুধা,
এই ব্যাধিত বিকারের রক্তপানের তৃষ্ণা,
আর এগারো অক্ষৌহিণীর উরুতে চাপড় মারা উল্লাস,
আর সাত অক্ষৌহিণীর গদা ঘোরানো আস্ফালন,
না, আমি প্রলুব্ধ নই তোমাদের ঐ স্বর্গে,
যতো ধর্ম স্ততো জয়—
শূন্যের ঘণ্টার মতো শূন্যে বেজে উঠে
শূন্যে গেছে মিশে।

৫

কী লাভ সেই তাঁতীর মায়ের
যার ছেলে গেছে যুদ্ধে ?
কী লাভ সেই জেলের বৌয়ের
যার স্বামী গেছে যুদ্ধে ?
উত্তরে দক্ষিণে কিম্বা অগ্নিকোণ থেকে নৈঋতে
কৃষকেরা মাথায় পাগ্ড়ি বেঁধে, কাকতাড়ুয়া, নির্বোধ,
দু' একটা তীর ছুঁড়ে কি না ছুঁড়েই চিৎপাত,
তারা এগারোর দলে বা সাতের যাই হোক
কী লাভ সেই বাজা মাঠের,
কে জিতল, কেইবা হারল।

এই উপদংশ আর নপুংসকের রাজ্যে,
এই ব্যাধিত বিকারের রক্তপানের তৃষ্ণায়,
অন্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে
একশটা গোঁয়ার অন্ধ,
আর ধর্মপুত্র নিজেই যেখানে জুয়াড়ী,
কার যুদ্ধ, কেইবা জেতে ?
হাসতে পারলে আমি নিজেই লিখে যেতাম
প্রচণ্ড একটা প্রহসন !
নিজের মৃত্যু দিয়েই আমি রেখে যাব ববং
আমার বিদ্রূপ,
আমার প্রতিবাদ !
ছ্যাখো, আকাশ থেকে মাটিব দিকে,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
নেমে এসেছিলাম আমি দারুণ একটা প্রতিশ্রুতি,
মানবী, তুমি লালন করতে পারো নি তোমার
বুকের তাপে
ভেসে গিয়েছি তাই কালের কল্লোলে
একটা ছিন্নবৃন্ত জবাব মতো তামাব থালায় !

আর দিনের পর দিন আমার অতৃপ্ত পিপাসা,
দিনের পর দিন আমার অসমাপ্ত স্বপ্ন
এই খর্ব বামন সংসাব, আর তার তোষামোদ,
খেপিয়ে তোলে আমাকে শয়তানের ক্রোধে,
আমি ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাব এই ছেলেখেলার
জয়-পরাজয়,
আর তার সাজানো আহ্লাদ, আর নকল বিরোধ,
একটা মাতাল শুয়োরের দাঁতের লাঙলে
উল্টে ফেলব আমি পাতাল,
আর বারবার আমি আসব,

আমার অতৃপ্ত কামনা, আমার অসমাপ্ত স্বপ্ন,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
শতকে শতকে আর দেশে দেশে আমি আসব,
যতোবার আমার রথের চাকা রাক্ষসী মাটি গিল্‌বে,
যতোবার আমাকে টেনে তুলবে ফাঁসির মঞ্চে,
আর জ্বলন্ত সীসের গোলকে ঝাঁঝরা করে দেবে শরীর,
বারবার আমি আসব,

আর মানবী, তুমি ধারণ করো সেদিন আমাকে
তোমার রক্তে,
লালন করো তোমার বুকের তাপে,
আমি তোমার ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন, আমি অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি,
দেখো, সূর্যের মতো কবচকুণ্ডলে
দীপ্ত হব সেদিন মধ্য গগনে,
আর মাথায় তোমার সেদিন পরিয়ে দেবো না
আমি সোনার মুকুট,
শুধু হাতে তুলে দেবো ধানের গুচ্ছ,
আর পৃথিবী আমার, পৃথা,
মানবী নয়, ডাকব আমি তোমাকে সেদিন
মা ব'লে।

যযাতি

১

আমার এই আরোপিত মুখোশ,
আমার এই ছিনিয়ে আনা যৌবন,
আর মজ্জার মধ্যে
সময়ের বজ্রকীটের দংশন,
যেন সংকটের দুটি শিঙের মধ্যে আমি টালমাটাল,
আমার এই মস্থিত বিষের গেলাসে আজ
কীসের ছায়া কাঁপে ?

বড় সুন্দর এই পৃথিবী, আর তার শুয়ে থাকার কৌশল,
বড় সুন্দর ঐ তার উদ্ধত পাহাড়ের আমন্ত্রণ,
আর উপকূলের তটরেখায় নোনা জলের খাঁড়ি,
যেন সমর্থ পুরুষকে তারা তাতিয়ে তোলে
সমুদ্রযাত্রার ডিঙি ভাসানোর ডাকে।
আর দিনের পর দিন তাই নতুন দিগন্তের নিশ্বাস,
দিনের পর দিন মিইয়ে-পড়া বুকে
টাটকা তাজা ভালোবাসার মাতাল করা উচ্চহাসি ;

আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল তারা নতুন জন্মের দুঃসাহসে
আর মুখের ওপর তাই প'রে নিয়েছি আমি
নতুন রঙ করা এই মুখোশ,
তার রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি এই
লুঠ ক'রে আনা যৌবন। ··
তবু হাজার বছর কেটে গেল, ভাখো,
এক মিনিটের ইন্দ্রজাল।

আর আমার তৃষ্ণার বেলাভূমিতে আজ
দাঁড়িয়ে আছি আমি একা—
পায়ের তলায় ফেলে রেখে শুধু
আমারই ভূলুণ্ঠিত ছায়া!

২

আজ মাথার ওপরে জ্বলছে শুধু একটা প্রশ্ন,
যেন রাত্রির আকাশে কালপুরুষের খড়্গ,
তোমার ঐ যৌবন, যা আমি
আহুতি দিলাম লালসার এই যজ্ঞে,
শোনো তুমি আমার অন্য শতক, অন্য যুগের যুবক,
তুমি শোনো,
তুমি কি নিজেই আমার পায়ে সঁপে দিয়েছ সেই
আনুগত্যের শপথ,
নাকি আমিই আমার পা চাপিয়েছি
মাথার ওপর তোমার
তুমি কি নিজেই এসে ঢেলে দিয়েছ তোমার
বুকভরা যতো ভালোবাসা,
নাকি আমিই তোমার ঐ হৃদ্‌পিণ্ডকে উপড়ে এনে
তার স্পন্দিত তাপ অনুভব করেছি হাতের তালুতে আমার?
কে জানে কী সত্যি, আর কী মিথ্যে!
হাজার ধনু সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঐ ডুবুরী
কে জানে কী যে তোলে সে? অশ্রু অথবা মুক্তো?
বুকের ওপর তলোয়ার রাখলে
অনেক সময়েই তো না-এর শিরা থেকে
ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসে, হাঁ। .....
রাত্রির আকাশে ঐ কালপুরুষের প্রহরী, ও তো জানে,
কী সত্যি আর কী মিথ্যে! এখন

কী লাভ লুকিয়ে আমার অপহরণের এই লজ্জা ?
কী লাভ জবার মালায় ঢেকে দিয়ে আমার
হাড়িকাঠের দুটি শিঙ !
তোমার ঐ ছিনিয়ে আনা যৌবন আমাকে প্রহার করে ॥

৩

যায়

হাজার বছরের বিলাসরজনী
যেন এক মিনিটের ইন্দ্রজাল !
শোনো তবে আমার অন্ত্য শতক, শোনো,
তোমার ঐ যৌবন যা আমি
আহুতি দিলাম আমার লালসার এই যজ্ঞে,
সে তো কাঁটা গাছের স্তূপ, শুধু সমিধ !
কোথায় পেলাম তোমার ঐ চোখের আড়ালে
জ্যোতির্বিদের মতো নতুন নক্ষত্র খোঁজার
আরো একজোড়া চোখ !
কোথায় পেলাম তোমার মতো
আদিকালের প্রেমিকা এই পৃথিবীকে
উঠতি বয়সের মেয়ের খুশিতে
ঝলমল করে হাসিয়ে তোলার যাদু ?
তোমার ঐ জাগিয়ে তোলার কৌশলে আমি উন্মাদ,
সবলে ধরেছি তোমার ঐ নারীকে আমার বুকে,
আর মত্ত কামুক আলিঙ্গনে সেই তন্বী
আবার কেমন হয়ে গেল দ্যাখো
লোলচর্মা জরতী ।-
কোথায় গেল আমার নতুন মনের দিগ্বিজয়ের ইশারা,
দিনের পর দিন শুধু বেশ্যার মতো সে-যে
চিতিয়ে রাখে তার মাংসময় ঐ শরীর ।

আর হাজার বছরের বিলাসরজনী তাই
হাজার-ফণা বাসুকীর মতো
উগরে দিয়েছে বিষ।
কে জানত বল, ভালোবাসাহীন বলাৎকার এমন
ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাতালে।
আমার পতন আমাকে ভাঙতে থাকে।

৪

দ্যাখো,
হাজার দিনের দোহনহীন স্বপ্ন আমার
ফিরে গেল, ঐ অস্তাচলের বাথানে।
হাজার রাতের বিলাস শুধু
পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি।
কী তুচ্ছ এই রাজবেশ, আর পরচুল।
খ'সে পড়ছে আজ
আরোপিত আমার মুখোশ।
মজ্জার সুরঙ্গে আমার বজ্রকীটের দংশন।
দ্যাখো, তৃষ্ণার বেলাভূমিতে আমি
দাঁড়িয়ে আছি একা—
আমার পায়ের তলায় ফেলে রেখে শুধু
একটা ভ্রষ্ট শতকের ভূলুণ্ঠিত ছায়া।…
মৃত্যু কি এরও চেয়ে বেশি নরকে ভোগায়
তার ঐ বিষ্ঠাময় কালো
আদিম জ্বালার অন্ধ উদরে গিলে।

লে নি ন

লেনিন

১

আমি যখন বাড়ি ফিরি
জুতো-জামা-পাৎলুনের বাহন হিসেবে,
একটা শাঁসহীন খোলস,
মাথার মধ্যে যখন
জ্বালা, স্নায়ুর লড়াই, আর নিজেকে নিজে পিঠচাপড়ানি,
সেইসব হাস্যকর দীনতার দেউলিয়া দিনান্তে
আমি যখন বাড়ি ফিরি,
এক-বাস্ তোবড়ানো টাল-খাওয়া
টিনের পুতুলের সঙ্গী হিসেবে,
স্মৃতির মধ্যে যখন কচ্ছপের খোলার মতো শূন্যতা,
আর ক্লান্তি, বিষক্রিয়ার মতো ছড়িয়ে পড়া ক্লান্তি,
তখন, ঠিক তখনি,
এসপ্ল্যানেডে মোড় নিতেই
আমার চোখের ওপর উদ্ভাসিত হয়
তোমার মুখ—
তোমার ব্রোঞ্জের মুখ,
পৃথিবীর স্নিগ্ধতম ঝরণার চেয়েও যা
সুপেয় তৃপ্তির গভীরতর আহ্বান।

আমি তাকাই তোমার ঐ মূর্তির দিকে,
তুমি, আমাদের এই কলকাতায়, চৌরঙ্গির মোড়ে,
এলোমেলো ট্র্যাফিকের ঘোলা জলের ঘূর্ণিতে
দাঁড়িয়ে আছো যেন আলোকস্তম্ভ,

তুমি, তোমার ঐ ব্রোঞ্জের ঠোঁটে অর্ধোচ্চারিত হাসি,
দাঁড়িয়ে আছো যেন গতির মধ্যে—
ওভারকোটের উড়ন্ত ভাঁজে,
ঈষৎ-তোলা চিবুকের দূর-লগ্নতায়
চলমান মুহূর্তের ওপর পা রেখে
যেন এস্‌কালেটারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এগিয়ে আসছ তুমি আমাদেরই দিকে,
যেন হাত বাড়ালেই
বাড়িয়ে দেবে তোমার হাত—
যার আঙুলের মধ্যে বয়ে চলেছে
সাড়ে পঁচিশ কোটি মানুষের ভালোবাসা।

তাই এক-বাস্‌ তোবড়ানো টাল-খাওয়া
টিনের পুতুলের সঙ্গী থেকেও
উচ্চারণ করতে পারি আমি তোমার নাম—
লেনিন!
আর আমার এই মলিন দিনান্ত হ'য়ে ওঠে
দর্পণের মতো উজ্জ্বল,
সেখানে চোখ রাখলেই
ভাবতে পারি আমিও—
মানুষের কথা।

হ্যাঁ মানুষ—
মানুষের স্বপ্নের মধ্যে মানুষ,
মানুষের শস্যের মধ্যে মানুষ,
কেননা মানুষই বীজ এবং বৃক্ষ,
পৃথিবীর রক্তের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে
ছড়িয়ে পড়ে যার শিকড়, আর সবুজ

আহা সবুজ — যেন যৌবনের ঝলমল —
মানুষকে রোপিত করতে চাইলে তুমি
তার নিজের মাটিতে।

না খুনের বদলে খুন নয়, নয় সন্ত্রাস,
খুঁজে বার করতে হবে মানুষ,
একাকী আঘাতে নয় ফাঁসির দড়িতে মাথা,
লাখো লাখো হাতে ছিঁড়তে হবে ঐ দড়ি,
তুমি ভোলোদিয়া, সিমবির্স্কের কিশোর,
মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন
উচ্চারণ করেছিলে কঠিন —
না ও-পথে আমরা যাব না —
আর, আলেকজান্দারের মৃত্যুদণ্ডকে
ঘুরিয়ে ধরলে, যেন কামান,
আর তোরণের পর তোরণ পার হয়ে
তোপধ্বনিতে তার
মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল মানুষ,
ভেঙে ফেলল তারা
সন্ত্রাসের ঐ শীতপ্রা' 'দের দরজা,
আর ভোলোদিয়া তুমি ভ্লাদিমির থেকে
হ'য়ে উঠলে এই —
লেনিন!

২

লেনিন,
আমি তোমার কথা মনে হলেই
দেখতে পাই এক ঝড়ের পাখি —

পাতাল থেকে উঠে আসা
শত শত ডাইনির মারণ-ফুৎকার উপেক্ষা ক'রে
উড়ে চলেছে সে দুর্জয়,
ঠোঁটে তার গমের শীষ,
উড়ে চলেছে সে এক-আকাশ থেকে অন্য আকাশে,
যেখানে ঝড়-থামা আঙিনায়
দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী
মায়ের মতো,
যেখানে দিগন্তের আড়াল থেকে
সূর্য এসে উঁকি দেয় –
লাল জামা পরা শিশু।

তোমার কথা মনে হলেই
দেখতে পাই আমি একটা দেশ,
যেখানে বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছিল শুধু লোভ,
আর লোভের সঙ্গে হিংস্রতা –
যেন আগুনের সঙ্গে হাওয়া
যেখানে রাজপথে শুধু দেখা যেত বোজ
কশাক ফৌজের কুচকাওয়াজ,
আর পায়ে বেড়ি-বাঁধা
নির্বাসনের বন্দী।

আর ওদিকে আমির-ওমরাহের দিন
উড়ে চলত যেন প্রজাপতির পাখায়।
সেখানে হাতে-দস্তানা সুন্দরী নারীরা
তাদের হীরা-পান্নার হারে ঝিলিক তুলে হাসে,
আর স্ফটিকের ঝাড় লণ্ঠনে ঝলমল করে হলঘর,
সেখানে শুধু ভারী পোশাকের খসখস্

আর দামী সুগন্ধীর মৌতাত,
আলোর ছটায় ঝিলিক দেয় হঠাৎ কারো
কেতাদুরস্ত চশমা,
আর অন্ধকারের থামের আড়ালে
পরস্ত্রীর মুখচুম্বন,
ওদিকে বেজে চলে হয়তো মোৎসার্ট,
শোনা যায় মদের গেলাসের টুংটাং,
লাল কার্পেটের ওপর জোড়ায় জোড়ায় নাচ,
হঠাৎ কারো ভারী গলায় অর্ধমত্ত রসিকতা,
আব বিলাসী ঐ ফাঁপা মানুষদের
অট্টহাসির হুল্লোড়,
যেন সমস্ত কান্নাকে ডুবিয়ে দিতে চায়
ফুর্তিতে।

লেনিন
তোমার কথা মনে হলেই আমি দেখতে পাই
দিগন্ত অবধি খামারের পর খামারে
সেইসব ঝুলি-ঝুলি ধোকড় গায়ে মানুষগুলি —
যারা চিবদিন পেয়েছে শুধু
চাবুক আর খিস্তি,
যারা মাথা নিচু করে চলেছে চি ·দিন,
সেইসব মানুষ, যাদের চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে,
কেননা ভালো করে তাকায়নি তারা কতো বছর,
যাদের মুখের কথা শিশুর চেয়েও কম আর দুর্বোধ,
কেননা কথাই বলতে পারেনি তারা কতো বছর,
সেইসব কোটি কোটি সংখ্যার ছায়ামানুষ,
তোমার কথা মনে হলেই দেখতে পাই
যেন দ্বিমাত্রিক সেই রেখাচিত্রে
আস্তে আস্তে লাগতে শুরু করেছে রঙ,

আর চোখেও যেন তাদের
এই প্রথম লাগল এসে
সূর্যের আলো ;
তাই শিরদাঁড়া খাড়া করে
দাঁড়াতে চাইল তারা মাটির ওপর,
এবং কী আশ্চর্য, দ্যাখো,
পৃথিবীটাও যেন বড় হয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে,
আর তাদের ছায়াশরীরের ভেতর
স্পন্দিত হতে শুরু করল ক্রোধ—
ক্রোধ, যেন পূর্ণিমার উল্টোদিকের অমাবস্যা,
কেননা জীবনকে ভালোবাসা এই তাদের প্রথম।

তোমার কথা মনে হলেই
আমি দেখতে পাই
সেন্ট পিটার্সবুর্গ কি মস্কোর সেই কারখানাগুলো
আর তাদের তেলকালিমাখা শ্রমিকদের,
ইঞ্জিনে, বয়লারে, ব্লাস্ট ফার্নেসে আর টার্বাইনে
জীবনকে তারা আঙুরের মতো নিঙড়ে দেয়
সুখী মানুষদের গেলাসে,
সারাদিন তাদের কানে শুধু যন্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
ওপরওয়ালার অশ্লীল খিস্তি, আর দাঁত খিঁচোনো ;
আর ক্লান্ত সন্ধ্যায় বেরিয়ে আসে তারা
জিভের মধ্যে পোড়া কয়লার ছাই নিয়ে ;
তখন পরস্পরকে ঈর্ষা আর হতাশা ;
কীইবা করার থাকে তখন
শুঁড়িখানায় মদ গেলা ছাড়া ;
মদ গেলা, আর পরস্পরকে শাপমন্যি ;
আর ব্যারাকে ফিরে
বউগুলোকে পেটানো।

তোমার কথা মনে হলেই
দেখতে পাই আমি অন্ধকারের মধ্যে মশাল,
মশাল, কিম্বা মশালের মতো মানুষ,
তারা কথার পাশে বসিয়ে দেয়
ঠিক-ঠিক সব কথাগুলো,
আর কথাগুলোর মধ্যে বইতে শুরু করে নদী,
আর তখন সামনে এগোনো ছাড়া
কোনো উপায়ই থাকে না।…
তোমার কথা মনে হলেই
দেখতে পাই কতকগুলো ভালোবাসার হাত—
ক্ষতুর-হাত-থাকা মানুষগুলোকে টেনে নেয় তারা কাছে,
আর তাদের চোখের সামনে মেলে ধরে
মস্ত একটা আয়না—
হাঁটুভাঙা ঐ নিঙড়ে-নেয়া মানুষগুলো তাকায়,
দেখতে পায় তারা নিজেদের—
সেই খোচা খোচা দাড়ি আর রেখাবহুল তাদের মুখগুলো,
তাদের উকুন ভরা চুল, ঠোঁটের কোণে লালা—
দেখতে দেখতে দু চোখে তাদের
জ্বলতে শুরু করে আগুন,
আর এই আগুন থেকে জ্বালিয়ে তুললে তুমি
সারা দেশময় লক্ষ-লক্ষ মশাল…

আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই
দুনিয়া-কাঁপানো সেই দশদিন—
জীবনেরই জন্যে মরীয়া হয়ে-ওঠা সেই জীবন…
আর নভেম্বরের অষ্টমীতেই
অরোরা জাহাজ থেকে বেজে উঠল সেই তোপধ্বনি—
যেন শ্বেতহংসীর ক্রেংকার,
আর শীতপ্রসাদের চূড়ায় উড়ল
তোমার সূর্যোদয়ের নিশান।

৩

জীবনী তৈরি করুন
পড়ুয়ারা আর পণ্ডিতেরা।
একটি মানুষকে সাল-তারিখে ভাগ করা,
যেন দাগকাটা ওষুধের শিশি—
সেবন করুন যাঁর খুশি তিনি,
কিম্বা জরিপের ফিতে নিয়ে
মাপতে থাকুন তাঁরা
নদীর মতো ঐ নামকে···

কেননা নদীর মতোই বেড়ে চলেছে তোমার ঐ নাম,
ঢেউ তুলছে আর এগিয়ে যাচ্ছে সামনে,
বাঁকে বাঁকে তার নতুন বসতি,
জেগে উঠছে নতুন পলির চরা,
আর মোহনায় এসো একূল ওকূল সীমাহীন,
নদী যেন নদী নয় আর, সমুদ্র ;
একটি মানুষই তুমি
অথচ তুমিই হয়ে উঠেছ সারাদেশ।

জীবনী তোমার লেখা হচ্ছে তাই
কারখানায় আর খামারে—
গমের শীষে আর যন্ত্রের চাকায়,
মানুষের ঘামের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে,
তাশখন্দ থেকে লেনিনগ্রাদ
লেখা হয়ে চলেছে কোটি কোটি মানুষের রক্তের মধ্যে।

না, আমি ভুলি না সেই
দাঁতে-দাঁত চাপা অন্ধকারের দিনগুলো।

স্মলনির ছোটো বাড়ি খানিতে গম্‌গম্‌ করা মানুষ,
সময়ের শাঁস থেকে সেই তুষ-ঝরানোর প্রহর,
চারিদিকে শুধু চক্রান্ত আর ফিসফাস,
শত্রু ঘুরছে আনাচে কানাচে, আর দালাল,
মরা-খেকো শেয়ালের মতো
খ্যাক-খ্যাকে তাদের হাসি,
জীবনকে তারা কলুষিত করে রোগবীজাণুর মতো ;
আর জ্বলন্ত বুলেট আর কামান,
কামান আর গন্ধকের গন্ধ,
মাটির মধ্যে বিস্ফোরণের গর্ত
যেন নর-করোটির চক্ষু-কোটর,
আর ছাইয়ের মতো সকাল,
শূন্যের উদরের মতো রাত্রি ···

আমি ভুলি না সেই দিনগুলো
মৃত্যুর আস্তানার দিকে বুকে হেঁটে এগোনো লালফৌজ
ক্রেমলিনের নিদ্রাহীন রাতে
সারাঘর শুধু পায়চারি,
বুলেটে-ঝাঁঝরা শহীদের শরীরে
কালো গোলাপের মতো জমাট-বাঁধা রক্ত,
আর খামারের পর খামারে আগুন,
কারখানার গলিতে বিস্ফোরণ,
আর শিশুর রক্তে লাল হয়ে যাওয়া রাজপথ···

আমি ভুলি না সেই ওলটপালট,
প্রত্যেক মানুষের শিকড় থেকে শুরু করে
সবুজের দিকে সেই অভিযান,
যেন মায়ের পেটে রয়েছে যেসব শিশু

তাদের সঙ্গে সংলাপ,
যেন সময়কে তার নিজের খাতে বইয়ে দেওয়া,
আর আস্তিন গুটিয়ে রাস্তায় নামা—
যে রাস্তা চলে গেছে
ধমনীর ভেতর দিয়ে রূপকথার দিকে,
গলন্ত ধাতু আর ট্র্যাক্টরের চাকায়
রচিত হয় যার দিনরাত্রি…
আর আমু দরিয়া থেকে বৈকাল হ্রদ অব্ধি
গোটা সোভিয়েতের মানচিত্রের সমান
প্রতিটি ঘটনা ও ইচ্ছের মধ্যে
জীবনী তোমার জন্ম নিচ্ছে তাই নতুন নতুন স্বপ্নে…

নীল এপ্রোন-পরা শ্রমিক যেখানে
মেশিনে তার গ্রীজ মাখায় ;
কিম্বা কার্পাস ক্ষেত থেকে
তুলো সংগ্রহ করে মেয়েরা—
মাথায় তাদের লাল স্কার্ফ বাঁধা,
তাদের আঙুলগুলো কী নিপুণ—
যেন পরিচর্যা করছে শিশুকে,
যেখানে নতুন-তৈরী ফ্ল্যাটবাড়িতে
বাস করতে আসছে নতুন কোনো দম্পতি—
বন্ধুবান্ধবের হৈহল্লা আর পানাহার, আর
ঘর খালি হতেই তড়িৎ গতিতে আলিঙ্গন ও চুম্বন
যেখানে এরোড্রামের রেডার-এর পাশে
অতন্দ্র জেগে আছে বিমানকর্মী ;
যেখানে পুরনো গির্জের আইকনগুলোকে
সাজিয়ে রাখছে মিউজিয়ামের ছাত্র।
যেখানে বরফ-কাটা জাহাজ চালিয়ে
উত্তরমেরুতে এগিয়ে যাচ্ছে

এস্কিমো-পোশাকের নাবিকেরা,
যেখানে খামারবাড়িতে তোলা হচ্ছে গমের আঁটি—
জামার হাতগোটানো মেয়েপুরুষ,
আকাশে উড়ছে একটি কি দুটি পাখি,
সমস্ত আবহাওয়া পাকা ফসলের গন্ধে মন্দির,
যেখানে ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান
নোট করছে তার চার্টের ওপর—
মাথায় তার বেরে-টুপি, কাৎ করা একপাশে,
মুখে তার কড়া তামাকের চুরুট,
যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডর দিয়ে
দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সাবলীল দুটি মেয়ে—
যাদের একজনের ঠাকুর্দা হয়তো ছিল
ইউক্রেনের ভূমিদাস,
আর অন্যজনের বাবা ছিল
কাজাকস্তানের মেষপালক,
যেখানে রেড স্কোয়ারে এসে ফোটো তুলছে
একজন নিগ্রো যুবক এক ভিয়েতনামী গেরিলার,
যেখানে ক্রেশ্-এর ছোটো ছোটো খাটে
রূপকথার ছবির মতো শিশুরা—
মাথায় তাদের সোনালি চুল,
লাল গাল কেমন আদর মাখা,
আর, হঠাৎ কেউ নিঃশব্দে হাসল স্বপ্ন দেখে······

সেই হাসির মধ্যে, সেই স্বপ্নে—
জীবনী তোমার দিগন্ত থেকে দিগন্তে
টাওয়ারের পর টাওয়ারের মাথায়
ইলেকট্রিকের হাই টেনশান তারে,
লালফৌজের অতন্দ্র কড়া পাহারায়,
ব্লাস্ট ফার্নেসের লালে,
ট্র্যাক্টরের লাঙলে,

চাইকোভস্কির বাজনায়,
মহাকাশচারীর সীমাহীনে·

শাদা পায়রার ডানায়।

৪

লেনিন একটি নাম,
এবং সে নাম মেঘের মতো এক স্বপ্ন —
কত যুগযুগান্তের ক্ষরিত অশ্রুর
সমুদ্র থেকে উঠে হাওয়ায় হাওয়ায়
লেনিনের নাম ছড়িয়ে দেয় আমাকে দেশে দেশে,
আর বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে থাকি আমি মাটিতে,
লেনিনের নাম দেখিয়ে দেয় আমাকে
প্রতিটি হৃদয়ের বীজ বোপ নব ঋতু,
কী মধুর আর কী দুঃসহ সেই রূপান্তর —
প্রসূতিঘরের যন্ত্রণার চূড়ায়
যেন নতুন শিশুর কান্না···
শোনা যায় কান পাতলেই
সেই তেপান্তরের পক্ষীবাজের ক্ষুরধ্বনি —
সময়ের দিগন্তগুলোকে চুরমার করা অভিযান।

লেনিন একটি নাম —
যেন ভালোবাসার পাসপোর্ট,
নতুন নতুন ঘরসংসারে, নতুন মানুষের দিকে —
রিকেটে-শুকিয়ে-আসা শিশুর পাশে
শুশ্রূষাকারিণীর মধ্যে,
বোমা-বিধ্বস্ত ব্রিজের নিচে
দ্রুত মেরামতের মধ্যে;

যে মানুষ বাঁচে, লড়ে, দূরে তাকায়,
যে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায় আর পা বাড়ায়,
পৃথিবীর যেখানে যতো হাত
তুলে ধরেছে জীবনকে জয় করার নিশান,
তাদের সবারই শিরার মধ্যে সেই নাম,
যেন ভালোবাসার এক নদী-
যে নদী বয়ে যায় মানুষেরই সংসারের পাশ দিয়ে
আর ঘরকুণো মানুষকে মনে করিয়ে দেয়
সমুদ্রের কথা, যা সীমাহীন।

আমিও তাই বেরিয়ে পড়ি
নতুন নতুন উপকূলের খোঁজে
যারা ভেঙে ফেলে কতো
আদ্যিকালের প্রাতিষ্ঠানের নোনাধরা ইমারত
আর তামাদি দলিলের মতো ছিঁড়ে ফেলে রোজ
পুরনো কতো বিশ্বাস,
সেখানে কালো রঙের নক্ষত্রের মতো
অদৃশ্য কতো দাহ,
আর কাঁধের ওপর ভারী হাত রেখে
হঠাৎ কারো পুরুষালি মেজাজের
বুক-উজাড় করা হাসি।

আর জীবনকে দেখা মানেই তো
সময়ের ধমনীর মধ্যে ঢুকে যাওয়া,
সেখানে একই সঙ্গে
মরুভূমির রোদ্দুরে কাঁটাগাছের কঙ্কাল,
আর অলিভ বাগানের শেষ প্রান্তে
বাদামী রঙের সূর্যাস্ত,
সেখানে আগুন লাগা আস্তাবলের
শূন্যে দু'পা তোলা ঘোড়ার মতো

তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার ;
আবার ভালোবাসার মানুষ জড়িয়ে ধরলেই
গোড়ালি থেকে উরু অবধি
টনটন করা জোয়ার।
মানুষের খোঁজে বেরিয়ে আমি
দেখেছি এই সংসার।
সেখানে সময় যেন বুল-ফাইট-এর এরিনা,
সেখানে সারারাত ধরে উল্কা ঝরে
অন্ধকারের আতসবাজিতে,
আবার মাইল মাইল পাহাড়ের ঢালুতে
পাইন বনের মাথার ওপর
সোনালি-সবুজ জ্যোৎস্না।

না, অনেক পথে গিয়েছি আমি,
আর বিপথও কিছু কম ছিল না—
সরু গলি আর প্রস্রাবের দুর্গন্ধ,
কিম্বা বাসি রুটি সস্তা মদ, আর
পচা মাংসে ভনভনে মাছি,
কিম্বা ক্রমাগত ঠিক দেয়ালের ওপাশেই
কবর খোঁড়ার শব্দ,
এবং নিশ্বাস-বন্ধ-করা অপেক্ষা ;
দেখেছি, ঝড়ে-ভাঙা ডালের সঙ্গে
মাটিতে আছড়ে-পড়া পাখির বাসা,
আর অন্ধকারের বুকের মধ্যে
আর্ত চিৎকারে ডানা ঝাপ্‌টানি।

হ্যাঁ, অনেক পথে গিয়েছি আমি,
অনেক পথ—
সেই, দিনের পর দিন লাঞ্ছনা আর উপহাস :
কিম্বা চাল-ডাল লকড়ির জন্যে

দেহপসারিণীর আত্মবিক্রয় ;
দেখেছি বুকে হাঁটু চেপে দিনের পর দিন উৎপীড়ন
আর হঠাৎ—
আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে যেন
চৌচির হয়ে যাওয়া পাথর !
দেখেছি শক্ত চোয়ালে ঘৃণার শপথ,
আর রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, শ্লোগান, বুলেট—
আর পাশের লোকটি লুটিয়ে পড়লেই
বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া সামনে ;
দেখেছি রুখে দাঁড়ানোর এই লড়াইয়ের শেষে
বদলায় কেমন জীবন—
কালিঝুলি মাখা মুখ মুছতে মুছতে
ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে আসে দুজন শ্রমিক,
আর এ-ওর সিগারেটে দেশলাই ধরিয়ে হাসে,
যেন কবিতার দুটি মিল ,
আর সময়ের বুকের শব্দের মতো
অদূরে কোথায় রেল ইঞ্জিনের শান্টিং ।

এই সংগ্রাম আর বিপরীত আমি দেখেছি—
ভিয়েতনামে, আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, কিউবায়,
দেখেছি আমি নিঃশব্দ হায়নার চতুর পদক্ষেপে
চিলির হিংস্র সন্ত্রাসে,
দেখেছি লাল পর্তুগালের জরদগব দুর্গে
নতুন জীবনের নিশান ওড়ানোর সাহসে ;

এই এক লড়াই, এই বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা আর সময়ের ফার্নেসে
বারে বারে ঢেলে দেওয়া জীবন,
আর নিষ্কাশিত করা যুগযুগান্তের ধাতুমল ;

এ ভাবেই ইস্পাত আর স্বপ্ন…

স্বপ্ন যেন সেই বারেবারে ছাইয়ের ভেতর থেকে
ডানা মেলে দেওয়া পাখি ,
স্বপ্ন মানেই আকাশ —
যে আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখায়
নীলাভ দ্যুতির এক মুক্তোর মতো বিস্ময় ।

৫

অনেক কবিতা লিখেছি আমি,
অনেক কবিতা ।
আমার কথার মধ্যে মিশে গেছে
হাড়ের গুঁড়ো, আর মাকড়শার জাল ।
আমি দেখেছি
সময় এসে পাল্টে দেয় কেমন দিনগুলোকে ,
সময়ের দমকা নিশ্বাসে
আমাদের স্থির দীপশিখাগুলো কেমন
জোনাকীর মতো জ্বলতে জ্বলতে
হারিয়ে যায় অন্ধকারে ।
কেমন ক'রে আমাদের সমস্ত কবিতার ওপর
নেমে আসে তুন্দ্রার তুষার ঝড়,
আর উড়ে যায় আমাদর প্রিয় লাইনগুলো
যাযাবর পাখির ঝাঁকের মতো
দিগন্তের পাতালে ।
প্রতিদিনই আমি লক্ষ্য করেছি
বুকের মধ্যে রয়ে গেছে বাসি রাত্রির অন্ধকার,
কথার মধ্যে পুরনো বইয়ের গন্ধ ;
যতোবার আমার মনে হয়েছে

দূরে কোনো এক রাস্তার মোড়ে
অপেক্ষা করছে আমার নতুন প্রেমিকা,
ভারবাহী পশুর ক্লান্ত জিহ্বার মতো
ততোবারই যেন আমাব চোখের সামনে ঝুলে পড়েছে
একটা নীল তৃষ্ণা······

যতোক্ষণ না তুমি –
যে ' . নিন,
আমার প্রতিদিনের ক্লান্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসেছ
বন্ধুর মতো,
আর অ। দখতে পেয়েছি –
রক্তের প্রত্যেক . . াটাই
মাটির নিচে চলে যায়
চুম্বনের দিনে ফিবে আসার জন্যে।

লেনিন, আমি যখন বাড়ি ফিরি
আর আমার মুখের ওপর উদ্ভাসিত হয়
তোমার ব্রোঞ্জের মুখ,
তৎক্ষণাৎ আমি দেখতে পাই
রেড স্কোয়ারে –
দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো
অন্তহীন মানুষের পাশে আমি,
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি
তোমার স্মৃতিভবনের দিকে,
শায়িত রয়েছ যেখানে তুমি
মহান··· ··

আহা, সেই আমার নবজীবনের তীর্থযাত্রা –
তোমার দিকে!
পাঁচটি মহাদেশের শত শত জাতি আর

উপজাতির মানুষের পাশাপাশি,
শাদা কালো বাদামি পীত,
সেইসব মানুষ যারা চোখের সামনে থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে
সময় অন্ধ যবনিকা,
সেই সব নারীপুরুষ—
চোখের দৃষ্টিতে তাদের ভালোবাসার আমন্ত্রণ,
তাদের প্রত্যেকের রক্তের মধ্যে
শত শত শহীদের দায়ভার,
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি আমরা
তোমার দিকে ···
আর সমাধি গৃহের নীরব পরিক্রমায়
তোমার ডান দিক থেকে ঘুরে,
পায়ের কাছ দিয়ে,
ঐ তোমার শায়িত মূর্তি,
আর বুকের মধ্যে কী তোলপাড়,
যেন দাঁড়িয়ে আছি আমি ইতিহাসের চৌমাথায়,
আর শুনতে পাচ্ছি তোমার নির্দেশ—
ঠিক সূর্যোদয়ের মতো······
যেন এক্ষুনি তুমি চোখ মেলবে,
তোমার সেই গভীর ভালোবাসার চোখ,
এগিয়ে চলেছি আমরা তোমার বাঁ পাশ দিয়ে
কিন্তু তাকিয়ে আছি তোমারই দিকে······
আর যখন বেরিয়ে এলাম
মনে হল যেন আমারই সঙ্গে বেরিয়ে এলে তুমিও
শত শত মানুষেব সঙ্গী হয়ে
আমাদের স্মৃতির মধ্যে, রক্তের মধ্যে,
কী মহান তোমার সেই পুনরুত্থান !

সময়ের সমুদ্রের তীরে
ভেজা বালির মাইল মাইল বিস্তারে

প্রতিদিনের পায়ের দাগ মুছে যায়
প্রতিরাত্রির অমরতা-বিনাশী ঢেউয়ে,
আর একই উপকূলে তৈরি হয় নতুন নিটোল বালি
নতুন দিনের পায়ের দাগের জন্যে।
লেনিন, তুমি সেখানেও—
তুমি জন্মে গেছ সেইসব মানুষের ঘরেও
যারা এখনো জন্মায়নি।
কেননা শিশুকে শেখাবে তুমি
মাটির নিচে কান পাততে—
যেখান থেকে উঠে আসে
মৃতদের সংলাপ,
কেননা প্রত্যেকটি গোলাপের মধ্যেই থাকে
অগণিত মানুষের ঘাম-অশ্রু-স্বপ্নের হাহাকার,
প্রত্যেকটি স্বপ্নের ফসলেই
কতো মানুষের কতো জন্মের কবর।......
শিশুকে শেখাবে তুমি সামনে তাকাতে—
দেখাবে, বালিতে গোঁজা মরচে-পড়া নোঙর ;
মৃত্যুর ছেদন দন্ত—সময়ের চোয়ালে ,
আর শূন্যে ঝুলন্ত বটগাছের ঝুরির মতো
অন্তহীন মানুষের যুগ-যুগান্তের ভালোবাসা—
ক্রমাগত কেমন নেমে আসতে চাইছে
মাটির দিকেই।

তাই যতোবার তোমার মৃত্যু,
ততোবারই তোমার জন্ম...... ..

পৃথিবীর সমস্ত রাস্তায় হেঁটে চলেছ তুমি,
সমস্ত নিদ্রাহীন পাথরে তোমার পদচারণা ;
পৃথিবীর প্রত্যেকটি লাঙলের পিছনে তুমি ;

খনি-থেকে-উঠে-আসা কয়লার গুঁড়ো-মাখা
ঘর্মাক্ত মানুষের মধ্যে ,
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তরের সময়,
এবং তাকে ভেঙে ফেলাব দিনেও ,
তোমার রঙ কখনো শাদা,
কখনো কালো, বা পীত, কি বাদামি ,
হাজার রকম মুখের আদলে বদলে যাবে তুমি ,
তোমার বস্তাবন্দী পাকা ধানের
কয়েক মুঠো ছুঁড়ে দেবে তুমি বীজক্ষেতের দিকে ,
খাঁচার পাখির মতো
পৃথিবীর সমস্ত ধাতুপিণ্ডকে শেখাবে তুমি
মানুষের ভাষা ,
আর রাত্রি তাব চোখেব পাতা খুললেই
যেমন সামনে এসে দাঁড়ায়
দিন,
তেমনি পৃথিবীর সমস্ত ক্ষারত বক্ত থেকেই
জন্ম নিতে থাকবে তুমি, লেনিন –
প্রতিদিন আরো বেশি উজ্জ্বল,
আরো সুন্দর,
মহান !
আমি যখন বাড়ি ফিবি –
জুতো-জামা-পাৎলুনের বাহন হিসেবে,
একটা শাঁসহীন খোলস,
এসপ্ল্যানেডে মোড় নিতেই
আমার চোখের ওপর উদ্ভাসিত হয় তোমার মুখ,
আর ঐ ব্রোঞ্জের মূর্তির ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসো তুমি আমারই সঙ্গে······
আমার হাতের মধ্যে হাত,
আমার চোখের মধ্যে চোখ,

চলে আসো তুমি আমার বাড়িতে,
আমার লেখার টেবিলে,
আমার রক্তে······

আর পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকারের ওপর
জ্বলতে থাকি যেন আমিও
ক্রেমলিনের তারা —

মৃত উল্কা ও অজাত শিশুর সংলাপ

অন্ধকারের বিশাল বন্তা
বাঁকানো কালো পিঠের ওপর ফেলে
আকাশের এ কোণ থেকে ও কোণ
মৃত উল্কার পাথর কুড়োয় যেখানে পাগল

নড়ে উঠেছে যেখানে ধক্‌ধক্ হৃৎপিণ্ড –
স্তব্ধতার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিযোগী এক পেণ্ডুলাম,
মুহূর্তগুলোর আহত মুখের ওপর যেখানে
সময়ের আঙুল খুঁড়ে তুলেছে শুধু বালি

ভালোবাসার সবুজ দীঘিতে
ডুবনো নৌকোর গলুইয়ে যেখানে
হাড়ের বাক্সে চাপা-পড়া কাছিমের স্নায়ুতে জাগে
সূর্য দেখার শিহরণ

রাজপথের অন্ধ ভিক্ষুক যেখানে
হায় হায় ক'রে ওঠে দুর্ঘটনায় থেঁতলানো
শিশুর কথা ভেবে

সমস্ত স্তব্ধতার বোবা দেয়ালে কান পাতলে
সারাক্ষণ শোনা যায় যেখানে
মাটির গভীর পাতাল থেকে উঠে আসা
সাপের মতো বিষাক্ত একটা হিসহিস শব্দ

আমার জামাকাপড় আর মুখোশগুলো খুলে,
কাত্রাসগড়ের খনিজ সন্ধ্যায়
কয়েকশ' আগুনের কাঁচা কয়লার স্তূপে
সংগ্রাম আর সৌন্দর্যকে নমস্কার জানিয়ে

আমার বাচাল জিহ্বাকে
শন্‌শন্‌ শাখার ঝাউবীথির পাতার ঝালরে উড়িয়ে
আমার ছিন্ন জানুর শোণিতের পাশাপাশি
সেই আশ্চর্য মির‍্যাকলের নদীর পুনরুত্থান খুঁজে

কেউ আমার কাছে এসো না
আমার হাতে পিস্তল,
একমাত্র মানুষই পারে
তার জীবনকে হাতের মুঠোয় নিতে

কিন্তু মৃত্যুতে কারই বা কী লাভ

আমাকে বরং এনে দাও
কয়েক কোটি হিলিয়ামের গুঁড়ো

চলো জঙ্গলের পাশাপাশি,
কাঠকাটার আওয়াজে
নিশপিশ ক'রে উঠুক বাঘের থাবা,

চলো তীর্থের পথে ছড়িয়ে দিই
মুঠোভরা নিকেলের পয়সা,
আর অন্ধ আতুর হা-ঘরে মানুষগুলোর সঙ্গে মিশে
কুড়োতে থাকি নিজেরাও

আমরা তো সবকিছুই এভাবে উশুল করি

বরং ঝাঁপিয়ে পড়া যাক্‌
অন্ধকারের তরঙ্গের ওপর
তলিয়ে যাই বরং মস্তিষ্কহীন যন্ত্রণার
শুশুক উল্লাসে

উড়ে যাও আমার চোখের অঙ্গার
তারার দিকে,
ডুবে যাও আমার শ্রুতির গুঞ্জন
ঝিঁ ঝিঁ পোকার মাটিতে,

বুকের ওপব আজ আমার বালি,
কী লাভ আমাকে খুঁড়ে,
আমাব আহত মুখেব ওপব
বক্তের আঁচড় কেটে এগিয়ে যায়
মুহূর্তের কাঁটা,

কতো দিন আমি দেখিনি,
ভোবেবেলার সূর্য,
দেখিনি কতো দিন সেই বাঁধের ওপর লাঙল নিয়ে
শিশির-ভেজা আলেব ওপব দিয়ে মাঠেব দিকে যাওয়া

আকন্দ আর ইটেব পাঁজা
মাঝে মাঝে মরা-নদীর খাড়িব ধারে
কবেকার পিকনিক পার্টির পোড়া মাঠ,
শকুনেব বিষাক্ত বিষ্ঠায়
বাকল-ওঠা গাছেব কঙ্কাল হাহাকাব,

কোথায় তুমি প্রলম্বিত পেণ্ডুলাম –
আমার হৃদ্‌স্পন্দের মুখোমুখি প্রতিযোগী চিৎকার,
বিশাল এক অন্ধকারের বস্তা পিঠে ফেলে
কোথায় তুমি যুক্তি শৃঙ্খলার শৃঙ্খল-ভাঙা পাগল,

আমার এই ছেঁড়া কাগজের আস্তাকুঁড়ে ফেলা স্মৃতি
আমার বোবায় ধরা ঘুমের দুঃস্বপ্ন,

ইনিয়ে-বিনিয়ে পাশ-কাটানোর এই
বাঁজা দিনগুলোর ভাঁড়ামি,
আমার এই এক শূন্য থেকে অন্য শূন্যের পতন,

এই পতন···

২

তুলে নাও আমাকে তোমার
সৃষ্টিছাড়া উদাসীনতার বাৎসল্যে,
খুলে যাক আমার কলকব্জার জোড়,

রাত্রির সমুদ্রে পেট্রোলের জাহাজে আগুন লাগার
অসহায় বিপরীতে আক্রান্ত আমার মন,
এই শয়তানের পাতাল থেকে কুড়িয়ে নাও আমাকে

আমার পোড়া শরীরের পাশে থাক
দামাল শিশুর ভাঙা খেলনা,

আমাকে তুলে নাও

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবার,
ইলিশের দর এখন কতো ?
মাদাম বিন দিল্লীতে এলেন,
ক্রুশবিদ্ধ যীশুর গির্জায় প্রার্থনার স্তোত্র সকালে,

ভ্যাপসা গরমে এই কাটাকুটি অক্ষর,
আমি কি নারী যে বত্রিশ নাড়ি ছিঁড়ে
জন্মাবে আমার ভবিষ্যৎ

কোথায় আমার সেই স্পন্দনশীল উষ্ণতার
নতুন জন্ম,
আমার শুধুই বোগেনভিলিয়ার শীতল আগুন,
মৃত নক্ষত্রের কোটি আলোকবর্ষ পেরোনো ভগ্নদূত

এ নাটকে কখন জর্জরিত সময়ের কশাঘাতে
চিৎকার ক'রে উঠবে
সত্যিকারের কোনো ট্র্যাজেডি,
কখন সেই রক্তের পিছনে অশ্রু,
শ্মশানের অন্ধকারের খনিজ শূন্যতায়
রেডিয়ামের নীলাভ দ্যুতি

গাঁয়ের ছিলাম আমি
নদী-নালার বিলের দেশে,
এখনো কোনো কোনো বিনিদ্র রাতের শিয়রে
আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে
প্রথম প্রেমের সেই নারীর মুখ

নোনা হাওয়ায় ঝরে-পড়া
টেরাকোটার সেই আদলে
বসিয়ে দিই আমার চোখ
চুম্বনে-চুম্বনে জাগিয়ে তুলি তার ঠোঁট

পোড়ো ভিটের জঙ্গলের জ্যোৎস্নায়
ডেকে ওঠে পাপিয়া,
দীঘির ঘাটে ভেজানো বাসনকোসনের স্বচ্ছজলে
সারা দুপুর ভাতের দানা খোঁজে পুঁটিমাছ,

মণি, তুমি শূন্যঘরে, একা,
তিন বছরের খোকা তুমি

ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছো জানলায়
চোখের সামনে যেখানে ডালিমের ডালে ডালে
টুকটুকে ফুলের সমারোহ

কয়েকটা স্মৃতির টুকরো,
ঋতুচক্রের পাকে-পাকে আকাশে যেমন
বদলে যায় নক্ষত্রের ছক
অথচ একই সঙ্গে দেখতে পাই না
একই পৃথিবীর অন্যদিকের মুহূর্তগুলোকে,

ঈর্ষার অন্যপিঠের সেই মমতা,
হৃদয়ের মাঝ-বরাবর সেই আমাদের জলবিভাজিকা.

এখানে সন্ধ্যার কারখানা থেকে
নিঙ্‌ড়ে-নেওয়া মানুষের ছিব্‌ড়ে বেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে
ওখানে লাল বাল্‌বের নকল বাগানে
ক্যাবারে লাস্যের ঝাঁজালো ছিপি খোলা.
কোন যাদুকর এই শ্মশানচিতার ওপর
বসিয়ে দেবে কড়ি-খেলার বাসর

ফিরে যাও তুমি আমার প্রথম প্রেম,
হে আমার স্বপ্নের রূপসী,
তোমার রক্তে ছিল মৃত্যুবাহী মশকের বিষাক্ত দংশন,
বিখ্যাত কবির প্রশংসিত চুলে ছিল উকুন,
প্লীহার ভারে আইঢাই হেঁটে চলেছিলে তুমি
গোলোকধাঁধার শূন্য বৃত্তে

না, আমার কোনো মোহ নেই
উদ্ধার চাই আমার শৈশব থেকে
আমার এই গোটা জীবন থেকে

খুলে ফেল তোমরা আমার জোড়গুলো
ছেৎড়ে পড়ুক স্প্রিঙের দম, কলকব্জা,
সমস্ত অক্ষরগুলোকে উল্টোপাল্টা করে
অকেজো করে দাও,
ছুঁড়ে দাও আমাকে তোমাদের রাস্তার পাশে
ঐ আস্তাকুড়ে

কুড়িয়ে নিয়ে যাক আমাকে ঐ
মধ্যরাতের পাগল,
অন্ধকারের আকৃতিবিহীন বস্তায়
নিয়ে যাক আমাকে সপ্তর্ষির আকাশে

৩

একটা ইঁদুরকেও
ছিটকে বেরোতে হয় স্ফুলিঙ্গ থেকে

পাতাল থেকে ঝলসানো মুখ লুসিফার,
বাদুড়েব দাঁতে এক অন্ধকাব থেকে অন্য অন্ধকারে
উড়ে যাওয়া আপেল

আমি কে

ভাঙা চেয়ারের পায়ার মতো
শূন্যে উৎক্ষিপ্ত কোটি কোটি স্বরলিপির বোবা কান্না

কোথায় আমার জন্ম ?
হিমঘরের লেবেল-আঁটা রক্ত
টাকার দামে বিকিয়ে যাওয়া নির্যাস

কোথায় আমার দক্ষিণ সমুদ্রের গগ্যাঁ, ‘
আদি রমণীর নিতম্ব,
হাঁপরের আগুনে ঘর্মাক্ত লাল মুখের
কামারের হাতুড়ি থেকে
অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটির মতো চাঁদ

শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থায়ী
নিটোল নিবিড় এক
মুহূর্তের বিষাদ,
বিশাল আকাশের দেবদূত

মরুভূমির ওয়েসিসে তৃষিত ইহুদীর প্রার্থনা থেকে বেরিয়ে
ইন্‌কাদের সোনার মন্দিরে লুটেরা তলোয়ারের রক্ত ঢেলে
গের্নিকার জ্বলন্ত প্রতিবাদের তুলি থেকে ছিটকে

: আজকাল আর ইয়েতে তেমন ইয়ে নেই
: ওদিকে ওসবও তো ঐ রকমই
: হাঃ হাঃ হাঃ
: যত্তো সব

আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির রাতে
কে তুমি নৃসিংহ মুখ,
জানলায় শ্বাস ফেল ?
রত্নখচিত স্ফটিকের স্তম্ভ
গর্জনে ভাঙে খান্‌খান্‌,
বিদ্যুতের নখে ছিন্নভিন্ন
দাঁড়িয়ে থাকার মাটি থেকে উপড়ে তোলো নাভিমূল ?

তুমি কি শুধুই সাড়া দাও
শিশুর ডাকে

সেদিন বাসের মধ্যে বেদম মার খেলো এক ছোকরা,
মানিব্যাগ সরিয়েছিল, ভাঙা ব্লেডের নিপুণ কৌশলে,
গায়ে প'ড়ে ছাড়িয়ে দিতেই
দৌড়ে ফুটপাথে উঠে সদর্পে ঘোষণা করল
বাসশুদ্ধু লোকের মাতৃবিহারের বাসনা

তখন বেলা দশটা
ছেলেটির বয়স দশ এগারো
সাতাত্তরজন যাত্রীর ডবল সংখ্যার চোখ
আমার দিকে

এই রিক্ত নির্বোধ ঊর্ধ্বশ্বাস মানুষের শহর
এই ঈর্ষা গ্লানি আর আত্মবঞ্চনায়
ছিন্নভিন্ন দিবারাত্রির উত্তাপ,
গঙ্গা, তুমি কি সত্যিই এসেছিলে
মহাদেবের জটা থেকে

জলের দু'পাড়ে শুধু শ্মশান

মর্বিড চিন্তা নাকি মানুষকে ঝুলিয়ে দেয়
অর্কিডের শূন্যে
আমরা কি কোনোদিন মাটি দেখছি
যে মাটিতে ছিটকে পড়ে
বত্রিশ-নাড়ি-ছেঁড়া রক্ত

সারাদিন শুধু ভাঙা টিউব-ওয়েলের
মাথার ওপর
তৃষিত কাকের হাঁ করা ঠোঁট,
মুণ্ডহীন কাঠের ঘোড়া
মৃত উল্কার পাথর

আমার এই তিন আঙুলের চাপে
কলম ধরেছি চল্লিশ বছর,
কতোকাল আর এই বাজা মেঘের আনাগোনা,
আফিং-খাওয়ানো সিংহের সার্কাসের লড়াই

এই যে তরুণ, লেখাটা কেমন লাগল,
এই যে বাপ্পা,
এই যে শান্তনু, লেখাটা কেমন লাগল,
সুনীল কি পড়েছে ? শক্তি — ?

বাংলার মুখ আমি কোনোকালে দেখিনি,
দেখলেও আজন্মের গোলোকধাঁধায় হাওয়া,
কবেকার যেন এক নবজাগরণের
ইতিহাসচর্চার ধোঁকাবাজি সারাদিন

সারাদিন শুধু নির্লজ্জ ভাঁড়ামি
কাপুরুষতা আর দালালী,
সময়ের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত মুখ

না, আমি এই হাড়ের বাক্সে চাপা
কাছিমের স্নায়ুতে চাই
সূর্যদেখার শিহরণ

যদি আমার জামাকাপড় আর কলকব্জা খুলে
লাঙলের মতো চলে যাওয়া যেত
সত্যিকারের কোনো চাষীর হাতে,
কিম্বা রচনারত কোনো নৈশ মেশিনের উরুর দিকে

সেই ইন্ধন যা কুমোরের চাকীতে ঘোরায়
কোটি কোটি নক্ষত্রবলয় থেকে দূরতর নক্ষত্রবলয়,,
ক্রোমোজমের সর্পমুখে দীর্ণ করে জন্মবীজ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘাতক অস্ত্রের পরেও
কয়েকটি মানুষের কণ্ঠে ক্রমাগতই ধ্বনিত হতে থাকে
না —

ঠিক তোমার কাছেই, কিন্তু কাছে নয়,
ঈগলের পাখায় নয়, বোবো ধানের কাদায় নয়,
অফিস এক্‌জিকিউটিভের টেলিফোনে, কিম্বা
ডেঁয়ো পিঁপড়ে সারির সামনে ব্যাঙের জিহ্বায় নয়,

কখনো কোনো ঘুমন্ত নারীর ঠোঁটের রেখায়
কিম্বা আইজেন্স্টাইনের ওডেসা স্টেপসের বুটের আওয়াজে
যুগযুগান্তের অশ্রু ও সংগ্রামের অগ্নিকুণ্ড থেকে
প্রবাহিত কয়েকটি মিরাকলের নদীর তরঙ্গে

অন্তহীন তৃষ্ণা, জিহ্বাবিহীন চিৎকার
হাঁ-করে মেলে ধরা অন্ধকারের বস্তা,

আমার সমস্ত সমিধ নাও, স্মৃতি নাও,
প্রতি মুহূর্তের কোটি কোটি পতনের শৈল ফাটলে জমা
কঙ্কালগুলোকে নাও

আজও, এই বয়সের সিঁড়ি ভেঙে দাঁড়িয়ে আছি আমি জানলায়
চোখের সামনে নেই এখন কোনো ডালিমের লাল ফুল,
মহাবলীপুরমের উদাসীন ষাঁড়ের প্রস্তরিত অমরতা,

কে যেন বাইরে ডাকল ? কে ?

আমার ছিন্নজানুর রক্তের আকাশগঙ্গা
জন্মের আগেই অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে বেঁচে
একাশি বছরের দিগন্তে ফণাতোলা সর্পদংশন,

আমার অন্তহীন সিঁড়ির আরোহণ ও অবসাদ,
আয়ুপদ্মের গভীর নিষ্কাসনে মধুর সঙ্গে ক্লেদ,

সূর্য তো ডুবেই যায়,
তবু বসন্ত, বর্ষা, হিংসা, স্তোত্র
মৃত্যু থেকে শিশুর দিকে যাওয়ার এই
ওডেসা-সিঁড়ির পেরাম্বুলেটারে বিকীর্ণ আসক্তি ॥

প রি শি ষ্ট

দীর্ঘকবিতা কেন লিখি

অনেক বছর ধরে কবিতা লেখার চেষ্টা করে চলেছি, কিন্তু কবিতার বইয়ের ভূমিকা লিখতে ইচ্ছে হয়নি। অনেকবার প্রকাশকের কাছ থেকে তাগিদ পেয়েও সাড়া দিতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা অর্থহীন, কেননা লেখক তাঁর নিজের রচনার বিষয়ে যা বলবেন, পাঠক তা মানতে রাজি না হতেই পারেন –বিচারের ভার তাঁর ওপর ছেড়ে না দিয়ে কবিতা-বহির্ভূত একটা জিনিস তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার সার্থকতা কী? এটা কি অনেকটা সুকুমার রায় বর্ণিত সেই 'গজাল মেরে গেঁজানো'র মতো হাস্যকর রকম করুণ হয়ে উঠবে না?

কিন্তু এবারকার ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের। লিখতেও রাজি হলাম সেইজন্যেই। তবে ভূমিকা নয়, পরিশিষ্ট—যা পাঠকরা পড়তেও পারেন, নাও পড়তে পারেন, কিম্বা পড়তে পড়তেই আমার সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করতে পারেন, বা পড়ার পর বেমালুম ভুলেও যেতে পারেন।

লিখছি একটা বিশেষ কারণে। অনেকটা জবানবন্দীর মতো।

কারো কারো হয়তো মনে থাকতে পারে, ১৯৩৬ সালে আমার প্রথম কবিতা বেরিয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত সেকালের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে'। আর প্রথম দীর্ঘকবিতা 'মোহিনী আড়াল' । কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কবি লেখার চেষ্টা করছেন তিরিশ বছর ধরে, তিনি হঠাৎ পুরনো রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে মোড় নিলেন কেন? বই তো বেরিয়েছে এর মধ্যে প্রায় ডজন খানেক, এত লেখালেখির পরও সহসা এমন কী ঘটলো যে দীর্ঘকবিতা না লিখে উপায় রইল না? একি নিতান্তই স্বাদ বদলের নেশায়, নাকি অন্য কোন অপরিহার্য তাগিদের জন্যে। এসব কথা সঙ্গতভাবেই মনে আসতে পারে। তাই এবার মনে হল বইটা যখন 'কাব্য সংগ্রহ' এবং বিশেষ করে দীর্ঘ কবিতারই সংকলন, তখন দশ বছর ধরে এই যে সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এর একটা কৈফিয়ৎ ধরনের কিছু দিলে সেটা বোধহয় খুব অযাচিত এবং অশোভন হবে না।

॥ ২ ॥

কোনো কবিই সমাজের বাইরে বাস করেন না। একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সময়ের সমাজই কবিকে জোগায় তাঁর কাব্যের উপাদান। কথাটার মধ্যে কিছু ফাঁক থেকে গেল, তা জানি। কেননা, আজকের পৃথিবী যেহেতু অনেক ছোটো হ'য়ে এসেছে যাতায়াত আর বইপত্রের আদান প্রদানের ফলে, পৃথিবীর সবদেশের তথ্য আর তত্ত্বও তাই হয়ে উঠেছে সর্বজনীন সম্পদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জ্ঞানীগুণী-সমাজতাত্ত্বিক বা বিজ্ঞানীদের বেলায় যাই হোক, কবি-শিল্পী সাহিত্যিকদের কিন্তু প্রধানতই নিভর করতে হয় নিজের দেশের সমাজ-পরিবেশের ওপরই।

এর অনেক সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে—যাঁরা ফ্রয়েড, য়ুঙ, পাভলভ এবং মার্কস, কডওয়েল, লুকাচ ফিসার প্রমুখের বইপত্র দেখেছেন তাঁরা সবই জানেন। একটা মূল কারণ, কবির মাতৃভাষা—যে ভাষার শব্দ দিয়ে তিনি কবিতা লেখেন—সেটা একটা বিশেষ সময়েরই অবদান। দ্বিতীয় কারণ—কবিতা বা যে কোনো শিল্পরূপই আসলে একটি কমিউনিকেশান বা সম্বোধন। তৃতীয় কারণ—কবির মানসলোক বা সংস্কৃত আলংকারিকরা যাকে বলেছেন বিভাবের জগত—তার সংগঠনে কবির বাল্য কৈশোরের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু এ ভাবে তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাতে প্রসঙ্গ থেকে দূরে চলে যাবার আশঙ্কা প্রবল।

যা আমি বলতে চাইছিলাম, কবি যেহেতু সামাজিক প্রাণী, আমার রচনাও সেজন্যে আমার সমাজেরই স্বপ্নফসল। বলা বাহুল্য এখানে 'স্বপ্ন' শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি না ইলিউশানের প্রতিশব্দ হিসাবে প্রয়োগ করেছি—কেননা, চলতি বাংলা 'ভ্রান্তি' বা ঈষৎ অচেনা শব্দ 'প্রতিভাস' ঠিক লাগসই মনে হয় নি।

রিয়্যালিটি এবং ইলিউশানের মধ্যে যে তফাৎ, 'বেস' 'সুপারস্ট্রাকচার' এর ভিতরকার তফাৎ-ই তার মূল কারণ। আর এই সুপারস্ট্রাকচার ঠিক ভ্রান্তির মতো নঙর্থক নয়, স্বপ্নের মতোই সদর্থক সংজ্ঞা—অন্তত যে অর্থে স্বপ্নকে আমরা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি।

ওপরে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতেই বোধকরি এটাও এখন আঁচ করা সহজ যে, আমি যখন বলি, কবিতা আসলে সামাজিক ফসল, তখন তা ঠিক মাঠের

ধানের মতো কোনো সরাসরি উৎপাদন হিসেবে ধরা হয় না। ফুলের মধু এবং মৌচাকের মধু যেরকম এক জিনিস নয়, কবিতার সত্তাও সেইরকম বাস্তব পরিবেশের হুবহু প্রতিফলন নয়। ফুলের মধু মৌচাকে জমা হয় মৌমাছির জৈব উপাদানকে তার সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে, সমাজের বাস্তবতাও সেইরকম কবিতায় ফিরে আসে কবির মানসলোকের ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সঙ্গে নিয়ে। এদেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাই বলেছেন, যে-কবির বিভাবের জগত যতো বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতায় ঐশ্বর্যবান, তাঁর কবিতা ততো বেশি সার্থক ও মহৎ হবার সম্ভাবনা।

আমার দেশে আমি এখন যে সমাজে বাস করি, আমার প্রথম কৈশোর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এ সমাজকে মোটামুটি প্রায় দুটি স্তর অতিক্রম করতে দেখেছি। একটা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার যুগ, যখন আমরা ছিলাম পরাধীন, এবং তারপর যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন ভারতের যুগ।

এই দুটি পর্বের মধ্যে পার্থক্য এতো বেশি যে সেটা প্রায় গুণগত পরিবর্তনের দরজায় এসে পড়েছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

প্রথমত, দেশ এখন রাজনৈতিক দিক থেকে পুরোপুরিভাবে স্বাধীন। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি, তারপর স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই দেশভাগ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, বন্যার মতো উদ্বাস্তু আগমন ইত্যাদির ফলে আগেকার দিনের সমাজ পরিবেশের আবহাওয়াটাই গেল একেবারে পালটে। বেকার সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল, মেয়েরা দলে দলে চাকরি করতে বেরোল, লুম্পেনের সংখ্যা বাড়তে লাগল, কালোবাজারী ও নারীব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করল বলতে গেলে আমাদের গোটা মূল্যবোধই যেতে লাগল বদলে। অন্যদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে উৎপাদনের ছক বদলাতে শুরু করল, কলকারখানা বাড়ল কিছু কিছু, কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণীও দেখা দিতে লাগল ধীরে ধীরে। আগেকার রাজা-বাদশা জমিদারদের দাপট কিছু কমল, যন্ত্রায়ণের চাপ বাড়ার ফলে শিল্পপতিদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। দ্রুতগতিতে আমরা সামন্ত যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগে হাজির হতে লাগলাম।

বুর্জোয়া কথাটা চলতি বাংলায় খুব একটা সম্মানজনক না শোনালেও, একথা কিন্তু সমাজতত্ত্বের যে কোনো পাঠকই জানেন—সামন্তযুগ থেকে বুর্জোয়াযুগ সমাজ প্রগতির অনেক উন্নত স্তর। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করতে হবে সেইসঙ্গে। কেননা দ্রুত যন্ত্রায়ণের ফলে উৎপাদন যে হারে বাড়ে, সে

হারে বাজার বাড়ে না—কারণ দেশের বেশির ভাগ মানুষ চাষী, এবং ভূমি ব্যবস্থায় এখনও সামন্তযুগের প্রভাব রয়ে গেছে বলে বেশির ভাগ চাষীরই ক্রয়-ক্ষমতা নগণ্য। তা ছাড়া যন্ত্রপাতিদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা কম নয় এবং বড় মাছ যেমন ছোটো মাছকে গিলে খায় তেমনি বড় ব্যবসা ছোটো ব্যবসাকে অচল করে তুলতে থাকে।

এই সমস্ত বহু বিচিত্র এবং এক-একসময় পরস্পর-বিরোধী কারণে সমাজের মধ্যে ভয়ানক রকম একটা টানাটানি, ভাঙচুর এবং টেনশান দেখা দিতে থাকে।

আমাদের দেশও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে চলেছে একই পরিস্থিতি। কেননা এখানেই রয়েছে একই সঙ্গে সর্বাধিক যন্ত্রায়ণ ও জমির ওপর বেশি চাপ। তাছাড়া কলকাতার মতো শহর যা ইউরোপীয় অর্থেই আর্বান, এই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

আমাদের বাংলা কবিতাতেও এখন এই বিভিন্ন এবং কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে। এবং আমিও যেহেতু এই ভাষাতেই লেখার চেষ্টা করি আমার কবিতাতেও নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনোভাবে ধরা পড়েছে এই সমাজেরই সুপারস্ট্রাকচারের প্রতিচ্ছায়া।

॥ ৩ ॥

এতক্ষণ যা কথা বলা তা অনেকটাই শোনাবে সমাজতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যার মতো। কিন্তু কডওয়েল তো অনেকে আগেই জানিয়ে গেছেন, এবং আমি তা বিশ্বাস করি—কবিতা লেখা বা কবিতা পড়ার জন্যে সমাজতত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে, কিন্তু কবিতা নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে সমাজতত্ত্ব অপরিহার্য। কেননা সেখানে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের প্রশ্ন ওঠে, সেগুলোকে তুলনা করে যথাযোগ্য জায়গায় বসাতে হয়, এবং তার জন্যে একটা ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত বা বিশ্বদৃষ্টিও দরকার। এত কাণ্ড করতে হয় এই জন্যেই যে সমালোচক কবিতাকে দেখেন বাইরে থেকে। তা সেটা যদি নিজের লেখা হয় তাহলেও নিরুপায়।

অবিশ্যি একটা পথ আছে, আত্মগতভাবে বিচার করে আমার ভালো লাগছে কি আমার খারাপ লাগছে, শুধু এই দিক থেকে যাচাই করা। আত্মগত কাব্যবিচারের পথ তো মোটামুটি এইরকমই।

মানুষের ইতিহাসের শৈশবে মানুষ বাস করত তার আদিম গোষ্ঠীগুলিতে যূথবদ্ধ ভাবে। তখন শিকারের কাজই হোক বা চাষের কাজ, সবই ছিল সকলের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপার। পরিশ্রম করত সকলে একসঙ্গে. ফলও ভোগ করত একসঙ্গে। তখন তার নাচগানও ছিল সমাজের সকলের ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করার পদ্ধতিতে মানুষ যতোই উৎপাদন পদ্ধতিকে উন্নত করে তুলতে লাগল ততোই তার সেই আদিম সমাজের মধ্যে নানারকম শ্রেণীভেদ দেখা দিতে শুরু করল। এই প্রক্রিয়াতেও সামন্ত যুগ পর্যন্ত অনেক নিপীড়ন সত্ত্বেও একধবনের সামাজিক ঐক্য বজায় ছিল—কেননা পুরো যুগটাই ছিল মোটামুটি কৃষি আর কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভবশীল—কিন্তু যন্ত্রযুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঐক্যেব স্থিতিশীলতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল। মানুষ তার আগেকার দিনের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ফিরে পেল বটে, কিন্তু সেটা কীসেব স্বাধীনতা? নিজের পরিশ্রম বা কাবিগরী নৈপুণ্যকে বাজাবে বিক্রি করাব স্বাধীনতা এবং বাজারে তা উদ্বৃত্ত হলে কাজ না পেয়ে অনাহাবে থাকার স্বাধীনতা।

শিল্পী এবং কবি সাহিত্যিকদেরও ঘটল ঠিক একই অবস্থা। আগেকার দিনের ছোটো গণ্ডির সমাজের মধ্যে তাঁদের যে সমঝদার পেতেন তাঁদের হারিয়ে অচেনা এক জনারণ্যে শিল্প কবিতার চর্চা করতে হতে লাগল তাঁদের। এবং যেহেতু তাঁর কোনো নির্দিষ্ট মাসোহারা বা সামাজিক আনুকূল্য নেই, তাই কবিতা ইত্যাদিকে পণ্য হিসেবে হাজির করতে হল বাজারে।

সহজেই অনুমান করা যায়, সংবেদনশীল কবিশিল্পীরা এর জন্যে কী পরিমাণ মর্মযাতনা ভোগ করতে শুরু করেছিলেন তখন।

একদিকে, তাঁদের মধ্যে দেখা দিতে লাগল নির্মম এই সমাজ পরিবেশের প্রতি অভিমান, বিদ্রূপ, ক্রোধ, ঘৃণা; অন্যদিকে, সমাজের বেআব্রু ছবিটাকে বাস্তবতার ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাস্তবতার দিকে পিছন ফিরে নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নেবার প্রবণতা।

বোদলেয়ার, যাঁকে র‍্যাঁবো বলেন, 'কবিদের মধ্যে রাজা' তাঁর মধ্যেই সব থেকে ভালো করে লক্ষ্য করা যায় অভূতপূর্ব এই পরস্পর বিরোধিতা। এ যুগের আধুনিক কবিতারও শুরু বোদলেয়ার থেকেই। একদিকে তিনি ছিলেন বাস্তবতার ভক্ত, অন্যদিকে তিনিই বলেন—শিল্পের জন্যেই শিল্প। ফরাসী বিপ্লবের এই সক্রিয় সমর্থক, বিপ্লব পববর্তী বুর্জোয়া যুগে তিক্ত পরিশ্রান্ত

একক মানুষের বিচ্ছিন্নতার পাঁকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা ফুলের মতো সুন্দরের তৃষ্ণাকে জাগিয়ে রেখেছেন আমরণ। বোদলেয়ারের 'পণ্য কবিতা', 'আলবাট্রস' এবং সুন্দরের স্তোত্র হিসাবে রচিত যে কবিতা সেই তিনটি রচনা লক্ষ্য করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে।

বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আসলে প্রকৃত স্বাধীনতা নয় বলেই কবিরা হয়ে ওঠেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজবিচ্ছিন্ন। নিজের মানসলোকের এই গভীরতর সংকটকে কাটানোর জন্যে তাঁরা ক্রমাগত কবিতার আঙ্গিক পালটাতে থাকেন — ঠিক যেমন বুর্জোয়া শিল্পপতিরা ক্রমাগত ব্যবসায়িক আবর্তে পড়ে বদলাতে থাকেন তাঁদের উৎপাদনের পদ্ধতিকে। এবং বাস্তব জগতের টেক-নোলজির উন্নতির মতো কবিতা বা শিল্পের এই টেকনিকেরও জটিলতা হয় খুবই বিচিত্রগামী। যেমন র‍্যাঁবো মালার্মে বা ভালেরীর কবিতা।

র‍্যাঁবোর কবিতায় আধুনিকতার গুণ ঠিক তাঁব যুগোচিত ছিল। প্রচলিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ তাঁকে এমন ব্যক্তি-বিয়োজনের (বা ডি পার্সোনালাজেশানের) দিকে টেনে নেয় যে তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহের সচেতন বিপর্যয় না ঘটাতে পারলে কবিতা লেখাই সম্ভব নয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আহত আত্মসম্মান তাঁকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যখন তিনি উচ্চারণ করেন, যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই যে তাঁর কোনো হৃদয় নেই। ('মাই সুপিরিয়ারিটি ইজ দ্যাট আই হ্যাভ নো হার্ট')।

কিন্তু উচ্চপর্যায়েব এই ইনটেলেকচুয়াল অযৌক্তিকতা যে একালের আধুনিক কবিতায় এক নতুন প্রজন্মের নায়কত্ব করেছে তাও স্বীকার করতে হবে। এই আঙ্গিক ক্রমাগত সিম্বলিজম্ এবং সুররিয়ালিজম্-এর পথে এনে দিয়েছে মালার্মে, ভালেরী, পাউণ্ড, এলিয়ট-এর মতো কবিকে।

এবং কেবল তাই নয়। মায়াকভস্কি বা ব্রেখ্‌টের কবিতাও কোনো-না-কোনো ভাবে ব্যবহার করেছে এই আঙ্গিক। পার্থক্য শুধু এই যে ব্রেখ্‌ট তা ব্যবহার করেছেন রয়ে সয়ে, এবং আঙ্গিকের ভেতর দিয়ে রূপ দিয়েছেন সমাজ প্রগতির স্বপ্নকামনাকে। এবং মায়াকভস্কি তাকে প্রয়োগ করেছেন প্রথমত সমাজ-বিপ্লবের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে এবং বিপ্লবের পরে তা প্রয়োগ করেছিলেন, গঠনকর্মে উদ্দীপনা সঞ্চারের কামনায়।

কিন্তু একটু বেশি এগিয়ে গেছি, আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

র‍্যাঁবোর পরে দেখা যায়, মালার্মের কবিতায় বিচ্ছিন্নতা আরো নিবিড় হয়ে

উঠল। 'শিল্পের জন্যেই শিল্প' এবং 'বিশুদ্ধ শিল্প' (পিওর আর্ট) সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি শুধু সুন্দর সুন্দর শব্দ সাজিয়েই তৃপ্ত রইলেন। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই সেজন্যে দুর্বোধ্য, বরং বলা যায়, অবোধ্য। এবং তিনি ঠিক সেইটেই চাইছিলেন। কেননা, এক সমালোচকের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি চাইছিলেন পাঠককে দূরে সরিয়ে রাখতে। তাই বাস্তবতাকে সর্বপ্রযত্নে দূরে ঠেকিয়ে তিনি শুধু স্থিরদৃষ্টিতে খুঁজে ফিরতেন এক সর্বগ্রাসী 'না'-কেই। মালার্মের কথা হল, কবিতায় কোনো চিন্তার ব্যাপার থাকে না, থাকে শুধু শব্দ ('এ পোয়েম কনসিস্টস্ নট অব থটস্ বাট অব ওয়ার্ডস্')। বলা বাহুল্য কবির এ পরিস্থিতি নিতান্তই যে সবটা তাঁর ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির ফলেই ঘটেছিল তা নয়, এ সবের কারণ ছিল সমাজ পরিবেশের গভীরেও, এটাও মনে রাখা ভালো।

॥ ৪ ॥

কাব্য সমালোচনার বেলাতেও দেখা যায় এই আত্ম-অপসারণের প্রক্রিয়া। এর ফলে দেখা দেয়, একদিকে ফর্মালিষ্ট এবং অন্যদিকে ইস্থেটিক বা নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা। এঁরা হলেন সেই সব সাবজেকটিভ অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমালোচক যাঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

পরবর্তী কালে এ দলের একজন প্রধান প্রবক্তা হয়েছিলেন রিচার্ডস্। ইনি কাব্য-বিচারে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকেই একমাত্র নিরিখ বলে মানেন। এর জন্যে তিনি আমদানী করেছেন তাঁর 'সাইনেসথেশিয়া' তত্ত্ব—যা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত খুব একটা স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। ব্যাপারটা যা বোঝা যায়, শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় পাঠকের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার। ফলে এ তত্ত্বও শেষ পর্যন্ত 'ফর্মালিষ্ট' বা প্রকরণ তাত্ত্বিকদের মতোই যান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

কডওয়েল বলেছেন, একালের বুর্জোয়া আধুনিক কবিরা আঙ্গিকের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটাতে ঘটাতে হয়ে ওঠেন—প্রথমে 'ট্র্যাজিক', পরে 'পিটিফুল,' এবং সবশেষে 'ভিশাস'।

একালের বুর্জোয়া সমালোচক, যাঁরা শুধু আপন মনের মাধুরী দিয়েই কবিতাকে বিচার করেন, তাঁদেরও পরিণাম হয় একই রকম।

বুর্জোয়া কবিরা, বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের মতোই ক্রমাগত লিবার্টি, অর্থাৎ

ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা আউড়ে যান, কিন্তু ক্রমেই তাঁরা দেখতে পান তাঁদের ফ্রি-মার্কেটের দুর্দমগতিই তাঁদের হাত থেকে ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছে ঐ লিবার্টি। এবং ক্রমাগতই তাঁরা হয়ে উঠেছেন, কডওয়েলের ভাষায়, তুচ্ছ, শূন্য, নিরাপত্তাহীন।

বাঙালি লেখক হুতোম বলেছিলেন নবাবী আমল সূর্যাস্তের সোনার মতো। কথাটা বুর্জোয়া যুগের কবিদের ক্ষেত্রেও হুবহু খেটে যায়। তাঁদের কবিতা তার অজস্র বর্ণসমারোহ দিয়েও তার ভবিষ্যতের গাঢ়তর সংকটের অন্ধকারকে আড়াল করতে পারেননি।

এ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে শুধু সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে মনে রেখে প্রগতির অনিবার্যতার বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হলেই। তার উজ্জ্বল উদাহরণ, মায়াকভস্কি এবং ব্রেখ্‌ট। এবং অবশ্যই লোরকা, এবং একালের নেরুদা।

বলা বাহুল্য, এরকম লেখকদের মধ্যেও নানারকম দ্বিধা এবং দোটানার ভাব, এমন কি মাঝে মাঝে নৈরাশ্যের কিছুটা ছাপ আবিষ্কার করা শক্ত নয়—কেননা তাঁরা কেউই ঠিক সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী জগতে বাস করেন·নি—এমন কি মায়াকভস্কি সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করলেও সংকট থেকে উদ্ধার পান নি। আগেই বলা হয়েছে সমাজ-বাস্তবতাকে কবিতার মধ্যে অতো তাড়াতাড়ি প্রতিফলিত করা সহজ ব্যাপার নয়—বেস্‌ এবং সুপারস্ট্রাকচারের সম্পর্কটি এত সরাসরি নয়—কাজেই তাঁদের কবিতার এ সব লক্ষণ দেখে কারো উল্লসিত বোধ করার কারণ নেই; কেননা তাঁরা কখনোই নিজের সঙ্গে কোনো আপোশ করেন নি, বরং মানব-প্রগতির আদর্শতে ছিলেন অবিচল। এ প্রসঙ্গে মায়াকভস্কির বিষয়ে একটি উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়।

কিন্তু অনুবাদ উপস্থিত করার আগে আরো দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। মায়াকভস্কির জন্ম হয়েছিল বিপ্লব পূর্ববর্তী রুশদেশে। এবং বিপ্লবের পরে বেঁচে ছিলেন তিনি অল্প কয়েক বছরই। বিপ্লবী ছিলেন তিনি প্রথম থেকেই; কিন্তু যেহেতু তাঁর বাল্য ও প্রথম যৌবনে ছিল জার-তন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাব, এবং যেহেতু তিনি সেই প্রভাবের ফলেই ইউরোপীয় বুর্জোয়া কবিতার প্রধান পরীক্ষাগার ফরাসী সাহিত্যের দ্বারা ছিলেন বিশেষভাবে প্রভাবিত, তাই বিপ্লবের পরেও প্রচণ্ড উদ্যমে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হয়েও, তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের ধ্যানধারণার পিছুটানও

কোনো কোনো সময়ে তাঁকে পর্যুদস্ত করে ফেলত। তিনি অত্যন্ত সৎ এবং আন্তরিক শিল্পী বলেই নিজের এই দ্বৈতসত্তাকে নিজেই ধরতে পেরেছিলেন, এবং তার হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে আমরণ সংগ্রাম করেও গেছেন। যখন তিনি এই সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন তখন নিজেই তাঁর এই দ্বিতীয় সত্তাকে ধমক দিয়ে বলেছেন, 'কখনোই দুঃসাহস দেখিও না মায়াকভস্কির নামে কথা বলতে।' ('ইউ ডু নট ডেয়ার স্পিক ইন দি নেম অব মায়াকভস্কি!') তাঁর এই সংগ্রাম সেজন্যে মহান, এবং যে কোনো বিপ্লবীর পক্ষেই শিক্ষণীয়। যাঁরা নিজেদের এই আত্মদ্বন্দ্ব ও আত্মসংগ্রামের কথা চেপে গিয়ে, কিম্বা সে বিষয়ে একেবারে অচেতন থেকে, সমাজতন্ত্র কায়েম হবার আগেই সব পেয়েছির দেশের মানুষের মতো কবিতা লেখেন, তারা হয় অতিসরলীকরণের ভ্রান্তিতে যান্ত্রিক হয়ে ওঠেন, কিম্বা নিছক পুঁথিগত বিদ্যাকেই কবিতার মধ্যে উজাড় দিয়ে খুশি থাকেন—কিন্তু তাতে একটা বিচিত্র মোহসঞ্চারী মুখোশ পাওয়া গেলেও মানুষকে পাওয়া যায় না, এবং সেইজন্যেই এ কবিতা আমাদের বুদ্ধির তারিফ যে পরিমাণে পায়, আমাদের চেতনার মধ্যে সেরকম গভীর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

বিপ্লবের বেশ কয়েক বছর পরেও মায়াকভস্কি যে আত্মসংগ্রামে রক্তাক্ত হতেন সে তাঁর ঐকান্তিক বিপ্লবী কবি হবার সংকল্পের জন্যেই। তাঁর সংগ্রামটা অনিবার্য ছিল এই জন্যেই যে সময়টা ছিল তখন যুগ-পরিবর্তনের।

লুনাচারস্কি তাই বলেন, 'মায়াকভস্কির এই দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার অর্থই হল, তিনি আমাদের কাল-বদলের সময়টির একজন বিস্ময়কর প্রতিনিধি। যদি তিনি প্রতিপদে এভাবে সংগ্রাম না করে পথ পেরোতেন, হয়তো সেটা হতো দৈবঘটনার (মিরাকলের) মতো। যদি তিনি তার সত্তার অভ্যন্তরের সেই কোমল স্বভাবের পেটি বুর্জোয়াটিকে এবং তাঁর আবেগচালিত কবিতাগুলোকে ধ্বংস করতে পারতেন তবে হয়তো তিনি হতেন একজন সর্বহারা-কবি। সম্ভবত একজন সত্যিকারের সর্বহারা-কবি, যিনি আসবেন সর্বহারাদের ভেতর থেকেই, একজন সাচ্চা সমাজ-বিপ্লবী, যিনি লেনিনের ধাঁচে তৈরি, যেন একজন লেনিনই, যিনি কবিতা লিখছেন—তিনিই হয়তো আসবেন এই পথে। কিন্তু মায়াকভস্কি তো সেরকম কবি ছিলেন না। আর ঠিক এই জন্যেই, যে সংগ্রামে অনবরত লিপ্ত থেকেছেন তিনি, যে সব বাধাতে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, নিজেকে অতিক্রম করার জন্যে যে সংগ্রাম তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে

চালিয়ে গেছেন—সে সমস্তই হয়ে উঠেছে এত মূল্যবান।' (ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি, ইনোভেটার নিবন্ধ থেকে।)

॥ ৫ ॥

যাহোক ধান ভানতে শিবের গীতের মতো হয়তো ইতিমধ্যেই কারো কারো বিরক্তি ঘটিয়েছি। একালে কেউই কারো কাছে 'জ্ঞান' চান না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ঠিক তা ছিল না। কেন আমি দীর্ঘ কবিতা লিখছি সেই কথাটা জানাবার চেষ্টা করব বলেই এত কথার আমদানি।

আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশে আমি এখন যে সমাজে বাস করছি, তার মধ্যে রয়েছে, বহু বিচিত্র এবং এক-এক-সময় পরস্পর বিরোধী কারণে সমাজের মধ্যে ভয়ানক রকম একটা টানাটানি, ভাঙচুর এবং টেনশান।

আমার দীর্ঘ কবিতা লেখার কারণও এইগুলিই। কেননা ছোটো মাপের কবিতায় এই বহু বিচিত্র তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতকে আমি স্পষ্ট করা সম্ভব বলে মনে করছিলাম না।

একথা আমি আন্তরিক ভাবেই জানি, অনেক দীর্ঘ কবিতাতেই আমি ব্যর্থ হয়েছি। এমনও হতে পারে যে আমার কোনো দীর্ঘ কবিতাই ওৎরায়নি। কিন্তু তাতেও এ কবিতার অপরিহার্যতা কিছুতেই অপ্রমাণ হয় না। কেননা আমি বিশ্বাস করি, দীর্ঘ কবিতা রচনার সামাজিক কারণ এখন বর্তমান। এবং দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে আমি এটাও বিশ্বাস করি, কবিতা বা যে কোনো শিল্পরূপেরই সমাজ নিবপেক্ষ কোনো ভূমিকা নেই। এবং কেবল তাই নয়, তার সত্যিকারের কোনো অস্তিত্বই নেই।

পার্থক্য শুধু এইটুকু হতে পারে, কোনো কোনো কবিতা স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে তার অন্তঃসারশূন্যতাকে নানারকম আঙ্গিকগত উদ্‌ভাবনার ইন্দ্রজালে চাপা দিতে পারে; অথবা বুর্জোয়া যুগের আঙ্গিকগত উদ্বর্তনের ভেতর যেটুক যা গ্রহণীয় তাকে আত্মস্থ করে কবিতা হয়ে উঠতে পারে সমাজ প্রগতির দিশারী।

কিন্তু, আমি আগে যা বলেছি, লুনাচারস্কির যে বক্তব্য একটু আগেই অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে মায়াকভস্কির বিষয়ে, সেই প্রগতিশীল কবিতার মধ্যেও আত্মদ্বন্দ্ব থাকতে পারে প্রচণ্ড রকম। বরং তা না থাকলেই অবাক

হতে হবে, কেননা ব্যক্তি হিসেবে আমরা সমাজের যে অংশ থেকে এসেছি তার নাম পেটি বুর্জোয়া—আমাদের রচনা সর্বহারা কোনো শ্রেষ্ঠ কবির রচনার মতো সর্বদাই যদি দ্বিধাহীন হয়, তাহলেই বরং সেটা হবে বিস্ময়ের ব্যাপার।

আমার কবিতায়, এবং সেই কারণে আমার দীর্ঘ কবিতাতেও অনেকরকম আত্মদ্বন্দ্ব ও পতনের চিহ্ন আছে। আছে অনেক হতাশা এবং যন্ত্রণার রক্তাক্ত কাহিনী। কিন্তু আমি যুক্তি দিয়ে যেমন জানি, হৃদয় দিয়েও তেমনি বিশ্বাস করি, আমার দেশ এবং আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থাও বদলাবে। আর তা ইতিহাসের উঁচুনিচু পথ বেয়ে মানুষকেও নিয়ে যাবে সত্যিকারের এক স্বাধীনতার দিকে—যে স্বাধীনতা তার জীবনরস সংগ্রহ করবে সমাজবাসী সমস্ত মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতির মাটি থেকে। সে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা সূচিত করতে পারে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনই।

আমার বর্তমানের পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং আমার স্বপ্নের ঐ জগতের মধ্যে ব্যবধান এখনও যথেষ্ট। আর সেইজন্যে আমার কবিতাতেও রয়েছে টেনশানের চাপ। অনেক সময়ই হয়তো তাতে গোটা কবিতাই হারিয়ে ফেলেছে তার ভারসাম্য। কিন্তু সমস্যাটিকে আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করিনি, আমার দিক থেকে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

॥ ৬ ॥

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, দীর্ঘ কবিতা লেখবার কোনো মানেই হয় না এখন।

শুনে কখনো কখনো থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। কেননা, যাঁরা বলেছেন তাঁরাও কবি, এবং ভালো কবি, আর তাঁরা বন্ধুও আমার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার চলতে শুরু করেছি নিজের পথেই। আমার সময়কালের বহুধা বিভিন্ন স্বরবিন্যাস এবং বিবাদী, এমন কি যাতে রসাভাস ঘটে এমন কি কুস্বরও যাতে একটি কবিতার আধারে ধরা যায়—তার জন্যেই বার-বার আমার এই অনুশীলন। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, কিম্বা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংঘাত, অথবা একই ব্যক্তির দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে অন্তহীন সংগ্রাম—এইগুলো বারবার ফিরে এসেছে নানারকম কবিতায়। কখনো আমি নতুন মাটি চাষের সামিল করার চেষ্টা করেছি, কখনো বা পুরনো আবাদেই নিবিড়

চাষের ভেতর দিয়ে বেশি এবং উঁচু মানের ফসল ফলানো যায় কিনা তার পরীক্ষা করেছি—কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রয়াসকে মেলাতে পেরেছি কিনা সন্দেহ, কেননা তাহলে তো সে কবিতা হয়ে উঠত প্রকৃত অর্থেই মহৎ কবিতা—যে কবিতা লিখেছেন শেকস্‌পীয়ার।

এ উক্তির যা সমর্থন, বলাবাহুল্য তা আমার নয়, কডওয়েলের। তিনি ঐ প্রসঙ্গে আরো একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, যার অনুবাদ উপস্থিত না করে পারছি না—'এইজন্যেই মহৎ কবিতা সবসময়েই হয়ে থাকে দীর্ঘকবিতা।'

মহৎ কবিতা আমি একটিও লিখতে পারিনি, একথা আমার চেয়ে কেউই ভালো করে জানেন না। কিন্তু কোনো লেখক যখন কলম ধরেন তখন মহৎ কবিতা তিনি কখনোই লিখতে পারবেন না এ কথা ধরে নিয়ে লেখেন না। খেলায় যে নামে (কিম্বা যে কোনো প্রয়াসেই) সে হারবে জেনে নামে না—কেননা তাহলে গোড়া থেকেই সে হার-টাকে মেনে নিয়ে খেলতে থাকে। আর গোটা খেলাটাই তাই তখন তার কাছে প্রাণপণ জরুরী ব্যাপার থাকে না; তাই তার মধ্যে কোনো আন্তরিকতাও থাকে না।

কিন্তু কবিতা লেখা বা শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রথম শর্তই তো আন্তরিকতা এবং সমস্ত ব্যাপারটিরই অনিবার্যতা। কেননা কবিতা তো খেয়াল-খুশির বিলাস নয়, অপরিহার্য একটি সামাজিক কর্ম। এবং আর পাঁচটা সামাজিক কর্মের মতোই (তা সে আপিসের চাকরি বা কারখানা কি খেতখামারের কাজ যাই হোক, তার মতোই,) খুবই দায়িত্বশীল ও জরুরী কর্তব্য।

সেজন্যে প্রত্যেক কবিই চাইবেন নিজের এই বিশেষ ধরনের সামাজিক দায়িত্বটি সৎভাবে নিষ্পন্ন করতে। এবং ঠিক এইজন্যেই, দীর্ঘ কবিতা (তা মহৎ না হয়ে উঠলেও) লেখার চেষ্টা কাউকে কাউকে করতেই হয়।

এ চেষ্টা আমার আগেও অনেক বাঙালি কবি করেছেন, আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি। তফাৎ বোধহয় শুধু এইটুকু যে তাঁরা অনেকেই দু'চার বার চেষ্টা করে (অনেকেই সার্থক হয়েও) সে প্রক্রিয়া থেকে সরে গেছেন; আর আমি ক্রমাগত চেষ্টা করেও যা আমার বলবার-কথা তা যেন স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না।

কখনো তাই 'মোহিনী আড়ালে'র মতো আত্মমুখী কবিতা লিখে নিজের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে কাটানোর চেষ্টা করি নিজের দ্বিতীয় সত্তা সোমেনের সঙ্গে তর্ক করতে করতে। এবং ভাবি বর্তমান সভ্যতার বস্তু-বাহুল্য এবং

ভোগের লালসা কমিয়ে ভালোবাসা ও পারস্পরিক মমতার সম্প্রসারণ ঘটালেই মুক্ত হওয়া যাবে এ সংকট থেকে। আবার তারপরেই হয়তো যাই বিষয়মুখী কবিতা 'এই জন্ম জন্মভূমি'র দিকে—যেখানে সমাজের সর্বস্তরে নানা ভাঙ্গনের ছবির ভেতর দিয়ে এমন এক সংকটকে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা থাকে, যাতে বোঝা যায়, সমাজের গোটা কাঠামোটির আমূল পরিবর্তন ছাড়া এখন আর কোনো দ্বিতীয় উপায় নেই।

অর্থাৎ 'মোহিনী আড়ালে' যখন ভাবি, নিছক মমতার জাগরণেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা যাবে, তখন যে কবি ছিল বিচ্ছিন্ন, সে 'এই জন্ম জন্মভূমি'তে খুঁজছে একটা ব্যাপক সামাজিক অনিবার্যতার অংশীদার হয়ে নিজের পেটিবুর্জোয়া ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হতে।

পরবর্তী বই 'ভিয়েতনাম' এই প্রক্রিয়ারই অন্য ছবি—যেখানে এ যুগের এক মহত্তম মানবমুক্তির সংগ্রামের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই প্রেরণা যে, লেখকের নিজের দেশের সমাজ পরিবর্তনেও ঐ রকমই অনিবার্য।

কিন্তু এইভাবে প্রত্যেকটি বই এবং দীর্ঘ কবিতাকে আলাদা ভাবে বিচার করা আমার শোভা পায় না। সে কাজ সমালোচকের। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে পরিণতির যে ধারা ওপরে বিস্তৃত করেছি তা পরবর্তী অনেক কবিতাতেই উল্টো দিকে ঘুরে গেছে। 'আমাকে বাঁচতে দাও' এবং 'আমাকে জাগতে দাও' কবিতা দুটি তো বটেই 'তারই জন্যে আমি' এমন কি এ সংগ্রহের শেষ কবিতাটিও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা।

কেন এমন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা হয়তো এ নিবন্ধের পাঠক ইতিমধ্যেই অনেকটা পেয়ে গেছেন। আর কিছুটা উত্তর হয়তো পেতে পারেন আর্নস্ট ফিশারের উক্তি থেকে। ফিশারের যা বক্তব্য তার সারার্থ হল—বিষয়বস্তু কবিতার যাই হোক সেটা 'কনটেন্টে'র স্তরে উন্নীত হয় কবির 'অ্যাটিচ্যুডের' দ্বারা—কেননা 'কনটেন্ট' বলতে শুধু এইটুকুই বোঝায় না যে কী বলা হল, এটাও দেখতে হবে যে কেমন ভাবে বলা হল—এবং সেটা কোন পটভূমিতে, কী পরিমাণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত সচেতনতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। যেমন 'ফসল তোলা' এই বিষয়টি ব্যক্ত হতে পারে সুন্দর সরল পল্লী-কবিতার ভেতর দিয়ে, বা চিরাচরিত যৌথ ক্রিয়াকর্মের চিত্র হিসেবে, কিম্বা অমানুষিক একটা দুঃখকষ্টের ব্যাপার ব'লে, অথবা প্রকৃতির ওপর মানুষের জয়ের প্রতীক হিসেবে। সবই নির্ভর করবে কবির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। অর্থাৎ, তিনি কি সমাজের

সুবিধাভোগী অংশের পক্ষ নিয়ে বলছেন, নাকি 'উইক এণ্ড'-এ গাঁয়ে বেড়াতে যাবার সময়ে ভ্রমণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, অথবা একজন বিক্ষুব্ধ চাষী, বা একজন পরিবর্তনকামী সমাজতান্ত্রিকের মনোভাব থেকে লিখছেন।

আমি যখন ব্যক্তিগত আশা-হতাশার কথা নিয়েও লিখি তখনও কবিতার মধ্যে ঠিক কোন চেহারাটি ধরা দেয়, পাঠক তা নিজেই খুঁজে বার করবেন।

॥ ৭ ॥

শেষ করবার আগে আর দুটো কথা।

এক হল, আমার দীর্ঘ কবিতায় মাঝে মাঝেই 'মিথ'-এর ব্যবহার। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, এভাবে পুরাণের আশ্রয় না নিয়ে চলতি জীবন নিয়ে সোজাসুজি লেখেন না কেন? দীর্ঘ কবিতাকে দাঁড় করাতে আপনার এত ঠেক্নোর দরকার হয় কেন?

উত্তর দেওয়া নিরর্থক মনে করেছি এতদিন। কিন্তু এতই যখন লিখে ফেললাম এটাও জানাই।

আপত্তিটা ওঠে বোধ করি এই কারণে যে তাঁরা মনে করেন, 'মিথ' একটি আদিম ব্যাপার, এবং যাঁরা মিথের আশ্রয় নেন, তাঁরা বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে চান বলেই এভাবে পেছন ফিরে তাকান।

কথাটার মধ্যে সত্য যে কিছুটা নেই তা নয়, কিন্তু ভুল-বোঝাও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। বুর্জোয়া যুগের শেষের দিকে অনেকেই মিথের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের দোলাচল-চিত্ততা এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তব জগতের রূঢ়তাকে এড়াবার উদ্দেশ্যে। তাঁদের সাফাই গাইবার ধরণটা ছিল এই রকম—এযুগের যে সব সমস্যা তা আগেও ছিল, এবং ব্যাপারটা তাই চিরকালীন—চক্রবৎ একই ধরনের ব্যাপার ঘুরে ঘুরে আসে, তাই এ নিয়ে কিছু করতে যাওয়া নিরর্থক।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান কেন যে, লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁর বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করার ধারণাটাও বদলে যেতে পারে? 'ফাউস্ট' এই মধ্যযুগীয় উপকথা বর্ণিত চরিত্র নিয়ে মার্লো, গ্যেটে এবং টমাস মান লিখে গেছেন—কিন্তু তিনজনের বক্তব্য কি একই? কিম্বা একালের আরো একটা ভালো দৃষ্টান্ত যদি নেওয়া যায়—ব্রেখ্‌ট, তিনিও কি মিথ এবং প্যারেব্‌ল-কে ব্যবহার করেন নি? ঠিক এই কাজটি করেছেন কাফ্‌কাও। কিন্তু কাফ্‌কা আর ব্রেখ্‌টের তফাৎটুকু

ধরতে পারলেই বোঝা যাবে, মিথ ব্যবহারের উপযোগিতা এবং তার ক্রমোন্নতির পদ্ধতি। কাফ্‌কার সময়ে তাঁর পরিবেশে তিনি যা হতে পেরেছেন, তাঁর প্যারেব্‌লও হয়েছে সেই রকমই। এ রচনাগুলিতে বোঝা যায়, কাফ্‌কা নিঃসন্দেহে সেই নির্যাতিতের পক্ষে, কিন্তু তিনি সেই পীড়ন-যন্ত্র থেকে উদ্ধারের কোনো পথ পাচ্ছেন না। আর ব্রেখ্‌ট তাঁর মিথ ব্যবহারের মধ্যে দেখান সেই পীড়ন-যন্ত্রকে ভেঙে ফেলার সক্রিয় শক্তি — যে শক্তি আসে সমাজতন্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস থেকে।

এইসব মহারথীর পাশে নিজেকে সামান্য পদাতিক বলতেও লজ্জা হয়। কিন্তু এখানে বলছি উদ্দেশ্যের কথাই, সাফল্যের কথা নয়। সে হিসেবে 'পৃথিবী আমার পৃথা'র মধ্যে যে কর্ণকে দেখানো হয়েছে সে কি মহাভারতের চরিত্র, নাকি রবীন্দ্রনাথের? তার প্রবণতা কোন দিকে পাঠক নিজেই ভেবে দেখতে পারেন।

সবশেষে বলছি আরেকটি অভিযোগের কথা — দীর্ঘ কবিতায় আমি আগাগোড়া সমান কাব্যশক্তির পরিচয় দিতে পারি নি।

অবশ্যই তা পারি নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, দীর্ঘকবিতা অনেকটা সিম্ফনির মতো — তাতে সাঙ্গীতিক উত্থানপতন অনিবার্যই বোধহয়। এলিয়ট তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, যে-কবি 'মাস্টার অব দি প্রোজেয়িক' না হয়েছেন তিনি সার্থক দীর্ঘ কবিতার লেখকও হতে পারবেন না। কথাটা এক অর্থে খুবই সত্যি। কবিতাব তীব্রতা যদি আগাগোড়া একই রকম থাকে তবে তা শেষ পর্যন্ত তীব্রতাকেই নামিয়ে আনবে একঘেঁয়েমির স্তরে। সে জন্যে দীর্ঘ কবিতায় বহু বিবাদী স্বর এমনকি বিরুদ্ধ স্বর আবিশ্যক হয়ে ওঠে, যাতে স্তরে স্তরে সেগুলো কবিতার মধ্যে নতুনতর মাত্রা যোজনা করে তাকে উন্নততব তীব্রতার উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারে।

আবারও আমি স্বীকার করছি আমি তা পারি নি। কিন্তু পথ যে এটাই সন্দেহ নেই।

॥ ৮ ॥

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই সেই পাঠককে যিনি এইসব আবোলতাবোল কথা এতক্ষণ সহ্য করেছেন, এবং অবশ্যই আমি গভীরতর কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছেও যাঁরা আমার কবিতাগুলো পড়েছেন।

দে'জ পাবলিশিং-এর কর্তৃপক্ষের সহিষ্ণুতা অতুলনীয়—তাঁরা আমার মতো অলস লেখককেও এতটা লেখাতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁরা তো আমার বন্ধু, তাঁদের কাছে ধন্যবাদের কথা তুলব কী করে।

মণীন্দ্র রায়

—